গণ্শা

শ্রীহরিদাস পালিত

গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী—১৩

গণ্‌শা



(কাহিনী)

শ্রীহরিদাস পালিত

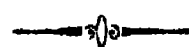
গৃহস্থ পাব্‌লিসিং হাউস্‌
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা
অগ্রহায়ণ—১৩২২

[মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র.

PUBLISHER
CHINTAHARAN GOOHA OF
The Grihastha Publishing House.
24, MIDDLE ROAD, ENTALLY.

PRINTER
ASHUTOSH BANERJEE,
The India Press.
24, MIDDLE ROAD, ENTALLY,
CALCUTTA.
1915.

নিবেদন



"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥"

পাড়ার লোকে আমাকে 'গণ্শা বলিয়া' ডাকিত। সে ডাকের মত মিষ্ট আহ্বান আর হইতেই পারে না। অমৃত অপেক্ষাও মিষ্ট যদি কিছু থাকে তবে 'গণ্শা' ডাকের মধ্যেই আছে। আমার দেশের লোকে যা বলে, যা করে তাই যেন আমাকে বড়ই মিষ্ট লাগে। গণ্শার মধ্যে আমার খাঁটী জীবনী নাই। আমার দেশের অবস্থার কথাই প্রায় পনর আনা রহিয়াছে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাস্রোতের মধ্যে দশের কাজে যাহা লাগিবে তাহাই লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক 'গণ্শা'টি একেবারে 'কাহিনী'। তাহা বলিয়া 'আলাউদ্দীন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের' গল্প নয়! খাঁটী ফটো!

কেহ কেহ, 'গণ্শাকে' দেখিয়া চম্‌কিয়া উঠিবেন। কেহ কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখিবেন। আবার কোন কোন মহাত্মা ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলিবেন। আমার মনে হয়—যাঁরা 'গণ্শা'কে চেনেন, তাঁরা ইহার কথাগুলি আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করিবেন। আবার এমনও লোক আছেন, যাঁহারা 'গণ্শা'কে পাঠ করিয়া বা শুনিয়াও কিছুই জানিতে

পারিবেন না। প্রকৃত পক্ষে ইহা 'দিল্লীকালাড্ডু' নহে যে—না খাইলেও পস্তাইতে বা খাইলেও পস্তাইতে হইবে! তবে ইহা কি!—

"অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে॥"

লোকে তোমার অক্ষয় অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; মানী ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিক হয়। দেশকে, দশকে বাঁচাইয়া চলিবার কথাই গণ্‌শার প্রাণ!

কলিকাতা
অগ্রহায়ণ—১৩২২

বিনীত
গ্রন্থকার—



গণশা

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাতি ও জাতিত্ব

"যত দিতে চাও কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে,—
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জাল জঞ্জাল গুলিতে!"
(রবীন্দ্র)

আমি জানি—আমার জাতি পতিত জাতি নহে। আমার জাতিরাও জানে, তাহারা পতিত জাতি নহে। হিন্দু-সমাজ-বেষ্টনী হইতে আমার জাতি বাহিরে পড়িয়া নাই। আমাদের হাতের জল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে সাদরে গ্রহণ করেন। আমাদের হাতের ভিয়ান করা মেঠাই মণ্ডা, হিন্দুসমাজের সকল স্তরে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা সচল হিন্দুজাতি। আমাদের রমণীগণ চিড়ে প্রস্তুত করে, মুড়ি ভাজে,

তাহাও হিন্দুসমাজের মধ্যে অবাধে চলিয়া যায়। আমরা তাঁত বুনি, জমি চষি, দোকান পশরা করি এই হিসাবে আমরা তাঁতি, চাষা ও মুদী। আমরা জাতিতে তাঁতি নহি, চাষের কার্য্যকরি কিন্তু চাষা নহি—তবে কৃষক বটি। আমরা হিন্দু, কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জাতীয় মানদণ্ডে আর্য্যজাতি বলিয়া গৃহীত হই নাই। এজন্য দুঃখিত নহি। দেখিতেছি এই মাপকাটীতে বঙ্গের প্রায় সমুদয় জাতিই আর্য্য পর্য্যায় ভুক্ত নহেন। আমাদের মাথার মণীগণই যখন আর্য্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত নহেন, তখন আমাদের বিষাদের কোন কারণই উপস্থিত হয় নাই। আমাদের জাতীয় উপাধি ‘গণেশ’। মালদহ, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলায় আমাদের স্বজাতীয় বন্ধুগণ বহুকাল হইতে বাস করিতেছেন। আমাদের জাতি ভারতের জাতি, তত্রাচ আমাদের জাতীয় ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ, ভারতের কোন জনপদ হইতে আগমন করিয়া, পবিত্র বঙ্গভূমিকে মাতৃভূমিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন কিনা তাহার ইতিহাস অদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই নাই। ভবিষ্যতে হয় ত আমাদের ভাবী বংশধরগণ তাহার অনুসন্ধান করিয়া কাণ্যকুব্জের মত কোন জনপদ পূর্ব্ব নিবাস বলিয়া দাবা করিবেন। ইহাতে সম্মানের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইবে কিনা তাহাও আমি বুঝিতে পারি নাই। ইহাতে আমার জাতীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে কি না, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইনাই। আমি জানি, বঙ্গদেশই আমাদের মাতৃভূমি—সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গ-রাণীর আমরা পুত্র। বঙ্গ আমার, জননী আমার, বলিয়া আমি আত্ম-গৌরব বোধ করি। কোন উপায়ে এই গর্ব্বকে খর্ব্ব করিবার অভিলাষ আমার নাই। বঙ্গরাণীকেই আমাদের মাতৃস্বরূপিণী বলিয়া দৃঢ় ধারণা আছে। এই পবিত্র ধারণাকে, এই পবিত্র স্মৃতিকে, মুছিয়া ফেলিতে

আমার তিলার্দ্ধ বাঞ্ছা নাই। আমার বঙ্গমাতাকে আমি কিছুতেই পর ভাবিতে চাহিনা। আমার জাতির মনে এ ধারণা সুদৃঢ়ভাবে বজায় রাখিতে চাই। মা আমার বিমাতা নহেন—প্রকৃত গর্ভধারিণী মাতা। বঙ্গমাতা আমাদের জাতীয় মাতা। একদিন আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতে পারি, আমি নাস্তিক হইতে পারি, কিন্তু বঙ্গমাতাকে জননী বলিয়া পরম ভক্তি ও প্রীতির নেত্রেই দেখি। মা আমাদের এই ক্ষুদ্র জাতির প্রকৃত মা! মাকে বিমাতা গড়িয়া আমাদের জাতিতত্ত্ব গঠনে, আমাদের বিন্দুমাত্র প্রয়াস নাই। শিক্ষার দ্বারা পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া যেন কখন এমন কুমতি না হয়, যে মাকে পর ভাবিতে শিক্ষা করি। বঙ্গরাণী আমাদের মা। ইহাতে আমাদের জাতি যদি আর্য্য মর্য্যাদা হইতে চিরবঞ্চিত থাকে, তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি। মাকে বিমাতা বা পালক-মাতা ভাবিয়া আর্য্য আখ্যা লাভের কুমতি, যেন আমার না হয়। বরং নরক-যন্ত্রণা, কুসুম-শয্যা বলিয়াই বোধ করিব, না হয় হীন পতিত জাতি বলিয়াই হিন্দু-সমাজে ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকিব, কিন্তু বঙ্গমাতাকে পর ভাবিতে পারিব না। আর্য্য হইলে স্বর্গবাস লাভ হইবে না। আর্য্য হওয়া অপেক্ষা আর্য্যকীর্ত্তি চিন্তন, সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর বলিয়াই বিবেচনা করি। আর্য্য-কীর্ত্তিপথের পথিক হইয়া মানুষ হইতে চাই! বৃথা আর্য্য নাম লইয়া বঙ্গমাতার কুপুত্র হইতে চাই না। আমার জাতি, আমার নিকট শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। পরে, কে কোথায় কি বলিল সে কথা লইয়া বৃথা বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। আমরা হিন্দু, নিবাস বঙ্গদেশ, ইহাই আমাদের প্রচুর পরিচয়, ইহা হইতে অধিক কিছু আশা আমরা করি না। আমরা বঙ্গের ক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া, বঙ্গমাতার পীযূষ-পানে পরিবর্দ্ধিত হইয়া মানুষ হইয়াছি। মাকে ছাড়া আমরা আর কাহাকেও জানিনা। যে কেহ জিজ্ঞাসা করিবে—প্রফুল্ল মনে উত্তর দিব, বঙ্গমাতা

আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা—এই পর্য্যন্ত আমাদের পরিচয়। ইহা ছাড়া আর কোন পরিচয় দিতে শিখি নাই, জানিও না।

বঙ্গ ভারত ছাড়া নয়। অনার্য্য জাতি যদি প্রকৃত ভারতবাসী হয়, ভারত যদি তাহাদের আদি প্রত্নোক হয়—ইহা ভারতবাসী অনার্য্যের পক্ষেও পরম শ্লাঘার বিষয় তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ভারতই তাহাদের আদি বিকাশের স্থান—আজিও সেই ভারতেই তাহারা বাস করিতেছে—ইহা কি কম গৌরবের কথা! আমি আমার জাতিকে এই গৌরব মুকুটে পরিশোভিত রাখিতেই চাই। স্বর্গ হইতে ভারতে আসিয়া আমাদের জাতীয় আদিদম্পতী প্রবাসী হইয়াছেন—এ পরিচয়ও আমি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করি। আমি সগর্ব্বে বলিতে চাই—বক্ষবিস্তার করিয়া, মস্তক উন্নত করিয়া, বলিতে চাই—আমাদের জাতি আদৌ ভারতজন্মা, ভারতবাসী। যাহার যাহা ইচ্ছা বলিতে পার—এই জাতি অনার্য্য, বর্ব্বর, কৃষ্ণকায় দস্যুর জাতি! মাথা পাতিয়া—আশীর্ব্বাদ বলিয়া আনন্দে গ্রহণ করিব। কি গৌরব! আমরা ভারতবাসী, ভারতই আমাদের আদি মাতা! কি আনন্দ, কি সন্তোষ! আমাদের প্রতিরেণু ভারতের জল, বায়ু, মৃত্তিকায় গঠিত! কাহারও নিকট ধার করা নয়! খাঁটি ভারতের আত্মা আমাদের চিদাকাশে নিত্য বিরাজিত—আমরা খাঁটী ভারতবাসী, প্রবাসী নই! এই গৌরবে, এই আনন্দে, আমাদের হৃদয় নিয়ত পূর্ণ থাকুক। ভারতের দর্পে, ভারতের গরিমায় হৃদয় নৃত্য করিতে থাকুক! এ সৌভাগ্য হইতে যেন আমাদের জাতি কখন বঞ্চিত না হয়। ভারতকে আমি ছোট করিতে চাই না। ভারত আমার—আমি ভারতের! বঙ্গ আমার, আমি বঙ্গের—কি সুন্দর! কি মনোরম! এই নিত্যানন্দ হইতে, এ মহান প্রেম হইতে, আমাকে আমি বঞ্চিত করিতে পারিব না—কণ্ঠ ছেদন করিলেও—না! আমি গর্ব্ব ভরে বলিব—মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া

বলিব—বঙ্গ আমার, আমি বঙ্গের। ভারত আমার, আমি ভারতের—চিৎকার করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিব—বঙ্গ আমার, আমার জাতি বঙ্গের। বঙ্গ আমার! আমার! আমার!

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ।"

কি মধুর সঙ্গীত! কি মহান্ প্রাণের ভাব! আমি ঐ ভাবে আমার হৃদয়ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া রাখিতে চাই। আরও উন্মত্ত হইয়া উঠি—আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাই—

"সপ্তকোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।"

পাষাণ গলিয়া যায়! বঙ্গমাতার প্রেমের ধারা প্রলয় প্রবাহে আবর্ত্তিত হইতে থাকে—গর্ব্বে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। ঠিক! খাঁটী যদি মনে হয়—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।"

তাহা হইলে বক্ষ প্রসারিত হইয়া উঠে, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে, চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু গড়াইয়া ধরণী সিক্ত করিয়া দেয়। মায়ের মূর্ত্তি—রাজ রাজেশ্বরী বেশে হৃদয়াকাশে আসিয়া দাঁড়ায়। কি অপূর্ব্ব মাতৃ মূর্ত্তি—কি অপূর্ব্ব রূপ! কি মধুর হাস্য!—দেখিতে দেখিতে চিত্তের সমাধি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়! বাহ্য জগৎ আর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য থাকে না! মধুর ভাবে আত্মহারা হইয়া, সুখ দুঃখের অতীত রাজ্যে বাস করিতে থাকি। আমার বঙ্গমাতার ঐ সোনার বাড়ী দেখা যায়! ঐ আমার মায়ের শান্তি-নিকেতন—ঐ আমার বঙ্গদেশ! আমি আমার দেশকে বড় ভালবাসি।

আমি জাতিতে গণেশ। 'গণেশ' জাতির কথা আপনারা কি কখন শুনিয়াছেন? না শুনিবারই কথা! এ জাতি একটা প্রকাণ্ড জাতি নহে। এ জাতির নরনারীর সংখ্যাও অধিক নহে। আমাদের মধ্যে কেহ

জমিদার বা রাজা খেতাবীধারী নাই, বড় পণ্ডিত, উকীল, বারিষ্টার, হাকিমহুকুমও নাই; সুতরাং এ জাতির পরিচয় বঙ্গদেশে আদৌ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু 'গণেশ' নামে এক জাতি বঙ্গদেশে আছে—ইহা সত্য, মিথ্যা নহে। আমাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক বলিয়া দাবী করিবার কেহ নাই। সুতরাং গণেশজাতিকে, কে চিনিবে? বঙ্গের অনেকগুলি অচেনা জাতির মধ্যে এ জাতিও একটি। দেখিতে পাই আমাদের জাতির খবর পর্য্যন্ত কেহ রাখেনা! অনেকেই জানে না, আত্ম-প্রচার করিতে হইলে নিজের ঘাড়ে ঢাক লইয়া, নিজেই বাজাইয়া নাম জারী করিতে হয়। পরের জন্য, পরে কিছুই করিবে না। সুতাল, বেতাল যে কোন তাল হউক, তাহাতেই নিজের স্কন্ধের ঢাকে কাটী দিয়া সোর-গোল করিতে হইবে। একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন—"নাম জারি করিতে হইলে, নিজের ঘাড়ে ঢাক লইয়া নিজেই বাজাইয়া বেড়াইতে হইবে।" ঢাকের বাজনা সুমিষ্ট নহে—শুনিয়াছি ঢাকের বাজনা থামিলেই মিষ্ট, বাজিলে নয়! তাই ভাবিতেছি, ঢাক বাজাই, কি থামিয়াই মিষ্টতা অনুভব করাই! এতকাল ত থামিয়া ঢাক না বাজাইয়া, যথেষ্ট মিষ্টতা অনুভব করাইলাম—কিছুই ত হইল না। কিন্তু যথেষ্ট চিন্তার পর স্থির করিলাম—বড় ভুল করিয়া ফেলিয়াছি—চিরকাল চুপ্‌করিয়া থাকিলে, কটু বা মিষ্টতা কিছুরই উপলব্ধি করান যাইবে না। কাণের কাছে জোরে, খুব জোরে ঢাক বাজাইয়া—কাণ ঝালাপালা করিয়া ঢাক থামাইলে তবে মিষ্ট লাগিবে। কেবল চুপে নয়!

আপনারা অনুমতি করুন—আমি ঢাক বাজাই। সাহিত্যিক, ঐতি-হাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রভৃতি মানবগণ বিবিধ প্রকারে ঢাক বাজাইয়া নিজ নিজ নাম জারি করেন। বঙ্গের শ্রেষ্ঠেতর জাতিগণও নিজের ঘাড়ে ঢাক লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। দেখিতেছি অনেকেই বাজাইয়া

বাজাইয়া, ঢাকের ডাহিনা ছিঁড়িয়া ঢাকের বাঁয়া বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে—থামে নাই, শেষে বাঁয়া ছিঁড়িলে ঢাকের খোল বাজাইবে! বাঙ্গালার জন্য বাঙ্গালীকে ঢাক বাজাইতে বড় একটা দেখিতেছি না। মুখ্যভাবে জাতীয়তার বেষ্টনী-বদ্ধ-ভাব দৃষ্ট হইতেছে; তবে গৌণভাবে ধরিয়া লইলে, সমগ্র বঙ্গের সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কথা উঠিতে পারে। আমাদের ছোটখাট 'গণেশ'-জাতির জন্য, কোন ঢেকো তাহাদের ঢাকে এক কাটীও বাজাইল না! আমরাও কিন্তু বাঙ্গালী! যদি ধরিয়া লই, বাঙ্গালার জন্য গৌণভাবে ঢাকের বাদ্যের প্রতিধ্বনি উঠিবার কথা—তাহাহইলে বলিতে হয়—আমাদের জন্যও হয়ত এক কাটী বাজান হইয়াছে। কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও বুঝিলাম না, ঠিক সত্য সত্যই বাজান হইয়াছে বা হইবে কিনা। যাই হউক্ আমরা কিন্তু ষোলআনা নিজের জন্যই বাজাইব না। সমগ্র বঙ্গমাতার সন্তানের জন্যই চৌদ্দআনা বাজাইব, বাকি দুই আনা নিজেদের জন্য, ফাঁকে ফাঁকে দু চার কাটী করিয়া সঙ্গত করিয়া লইব। এক্ষণে আপনারা অনুমতি করুন, ঢাক বাজাই! ঢাকের বাজনায় কাণ 'ঝালাপালা' হইবে। রাগ করিবেন না।

শিবের গাজনে ঢাক বাজে—কথায় বলে 'চড়ুকে ঢাকে' সন্ন্যাসী নাচে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। আমার গাজনে সন্ন্যাসী অধিক লইব না। সুতরাং গাজন নষ্ট হইবে না। ঢাক বাজাইব, ভূত নাচাইব, গাজন করিব। অনুমতি করুন ঢাক বাজাই। 'জয় শিব নাথ কি মহেশ'! ঢাকে কাটী পড়িল। কাণে আঙ্গুল দিন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ



আমার পল্লী

"বোধ হয় পাপিষ্ঠের অত্যাচার যত ;
নর-প্রকৃতিতে নাহি সম্ভবে কথন।
মনুষ্য-হৃদয় নহে পাপাসক্ত এত।
এই অল্পদিনে, দেহ হয় রোমাঞ্চিত
কি পাপে না বঙ্গভূমি হ'লো কলুষিত।"

(নবীন)

উত্তর-বঙ্গের কোন একটি জেলায় আমার নিবাস। পল্লীর নাম মালীগঞ্জ। আমাদের মালীগঞ্জের নিকটে 'কোদালীয়া বাথান' নামক স্থানে জমিদারের বাসভবন। আমাদের পল্লীটি খুব ছোট। আপনারা যদি আমাদের পল্লীটি দেখেন, তাহা হইলে পল্লী বলিয়াই বুঝিতে পারিবেন না। বন, জঙ্গল, বাঁশবন আর দিনের বেলাও অন্ধকার। দু পাঁচ খানা ভাঙ্গা-চোরা পর্ণকুটীর। আমাদের জাতি, কুঢ়াল (চামার) এবং ঘর তিনেক দরিদ্র, 'অন্ত্যভক্ষ ধনুর্গুণ' গোছের মুসলমান। লোক সংখ্যায় সর্ব্বসমেত জন কুড়ির বেশী হইবে না। অধিবাসীবর্গের মধ্যে কোন প্রাণীকেই পূর্ণভাবে স্বাস্থ্য-সুখ অনুভব করিতে দেখি নাই। পল্লীটির সীমামধ্যে পুষ্করিণী নাই।

খুব্ নিকটেও নাই, দূরেও ভাল পুষ্করিণী নাই। পল্লীমধ্যে গ্রাম্যপথ নাই। বৃষ্টির জল নিকাশের নালা নাই। পতিত জমি নাই। একটু গোচরভূমি নাই। পল্লীটি রাজা-মহাজনগণের আমবাগানে, বাঁশবনে-বেষ্টিত—বনময়। পল্লীবাসীর অধিকারে বাস্তুভিটা ব্যতীত বড় বেশী আর কিছু নাই। মশা, মাছি, শৃগাল, স্বর্প, ইন্দুর প্রভৃতির প্রচুর উৎপাত আছে। গোয়ালঘরে দু ই টি তিনটি গরু। তাহাও সকলের গোহালে নাই। কাহারও ধান নাই, ধন নাই, জন নাই, মান নাই, সম্ভ্রম নাই, জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নাই বলিলেই হয়। রোগে ঔষধ পায় না; ক্ষুধায় আহার পায় না। লজ্জানিবারণের বস্ত্র সকলের ভাগ্যে সকল সময় জুটে উঠে না। আমি তাঁতবুনি, দু পাঁচ বিঘা জমি ভাগে চষি। কেহ কেহ মহাজনের গৃহে গোলামী করে। হিন্দু-মুসলমান প্রায়ই চাকরী করে। ভাগে জমি চষে। দুইবেলা সপরিবারে পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পায় না। ঘরের দুধ শিশুকে না দিয়া বাজারে বিক্রয় করে। বাড়ীর গাছের শাক-পাত, ফল, মূল, গৃহস্থ না খাইয়া বাজারে বিক্রয় করে। তত্রাচ পেট্ ভরে না। ধরিয়া লউন, বর্ত্তমান পল্লীর অবস্থা এই প্রকার; বিশেষভাবে পল্লীচিত্র অঙ্কন করিলে, কালির পরিমাণ অধিক হইয়া, চিত্রটি একেবারে অন্ধকার হইয়া যাইবে, সেইজন্য কিঞ্চিৎ পাতলা রঙ্গে চিত্রাঙ্কন করিলাম। বর্ত্তমান অবস্থার সহিত ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার পল্লীচিত্রও প্রদত্ত হইল। একটু তুলনা পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

আমি পিতার নিকট শুনিয়াছি—আমাদের মালীগঞ্জ গ্রামে পাঁচশত লোক ছিল। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্যই আমাদের মালীগঞ্জে বাস। পল্লীর পশ্চিমে একটি বড় ঝিল ছিল, বারমাস তাহাতে জল থাকিত, বর্ষা-কালে তাহাতে স্রোত বহিত—নৌকা চলিত। উত্তরে একটা নদী ছিল, বৎসরের মধ্যে দুই একমাস উহাতে স্রোত বহিত না। ধান, চাল,

পাট, গুড় প্রভৃতির বোঝাই নৌকা, ঝিল ও নদীপথে বিক্রয়ার্থ আনীত হইত। আমাদের গ্রামের উত্তরে একটা গঞ্জ ছিল, সেখানে গোলা-ছিল। দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় চলিত। ঝিলের নিকটে ও পল্লীর চতুষ্পার্শ্বে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র ছিল। তখনকার উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রগুলি, এখন আম-বাগান ও বাঁশবনে পরিণত হইয়াছে। গ্রামটি কত বড় ছিল, তাহার নমুনা এখন দেখা যায়। এই যে গ্রামের বহির্ভাগে আমবাগানের ভিতর ও বাঁশঝাড়ের মধ্যে ডোবা দেখা যাইতেছে, ঐগুলি পূর্ব্বে গৃহস্থ-দের 'খিড়কী পুকুর' ছিল। অধিকাংশ পুষ্করিণী ভরাট হইয়া জমি হই-য়াছে। আমরাই অনেক পুষ্করিণীর গর্ভদেশ চষিয়া, পাটের ক্ষেত করিয়াছি। এখন অনেকগুলি জলাশয়ের চিহ্ন দেখা যায়। পঙ্কোদ্ধার না হওয়ায় এবং হলাকর্ষণ দ্বারা জলাশয় স্বেচ্ছায় ভরাট করা হইয়াছে। নিকটে নদী ও ঝিল সত্ত্বেও এতগুলি জলাশয়, পূর্ব্বেকার লোকে পুণ্যকামনায় এবং পল্লীবাসীর উপকারার্থে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এদেশে পূর্ব্বে বৎসর বৎসর বন্যা হইত, সুতরাং দালান কোটাবাড়ীর চলন ছিল না। সকলি প্রায় খোড়োঘর আর বেড়া। তাহা হইলেও এক এক খানা ভাল বেড়ার ঘর, তখনকার সস্তার বাজারেও হাজার টাকা ব্যয় করিয়া প্রস্তুত হইত। দুই এক খানা ইষ্টকগৃহও ছিল। গ্রামের উত্তরে একটি নীলকুঠি ছিল—গ্রামের অনতি পূর্ব্বে কালিকাপুরে দিনেমারদের কাপড় ক্রয় ও সুতার কুঠি ছিল—এ সকল পাকাবাড়ী। কালিকাপুর ও মালীগঞ্জ যেন একটি গ্রাম ছিল—মধ্যে সাহেবের কুঠি। আমাদের গ্রামের পশ্চিমে, ঝিলের ধারে, গঞ্জের মধ্যে সপ্তাহে দুইটা হাট বসিত। গ্রামের মধ্যে সরল দীর্ঘ পথ ছিল। এখনকার মত তখন পল্লীবাসীর অন্নকষ্ট, অর্থ-কষ্ট, প্রভৃতি কিছুই ছিল না। ক্ষুদ্র গৃহস্থেরও দশটি গরু ছিল। দুধ বিক্রয় হইত না। ঘৃত, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি গৃহস্থের বাড়ীতে প্রচুর পরিমাণে

থাকিত। আমাদের কোদালিয়াবাদার ঝিলের ও মরানদীর মাছে প্রচুর হইত ; দু কড়ার, বড় জোর চা'র কড়ার বেশী মূল্যের মাছ কেহ ক্রয় করিত না। দুইশত ঘর তাঁতি এই গ্রামেই ছিল। আমবাগান, কলাবাগান এবং তরিতরকারীর ক্ষেত বিস্তর ছিল। এ গ্রামের মালীপাড়ার মালঞ্চে বারমাস বিবিধ ফুল ফুটিয়া থাকিত। মালী, পাড়ায় পাড়ায় ফুলের জোগান দিত। মালঞ্চের ফুলের সুবাসে, গোটা পল্লীটি আমোদ করিয়া রাখিত। দেবালয়ে পুষ্প বিক্রয় হইত। গঞ্জের হাটে মালীরা ফুলের ডালা সাজাইয়া মালা ও কুচোফুলের সওদা করিত। সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাড়ীতে 'নাচ-ঘর' ছিল—প্রায়ই নাচ, গান, বাজনা হইত। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণে ধানের বড় বড় গোলা ছিল।

ঐ যে বেতবনের ধারে গো-ভাগাড় দেখা যাইতেছে, ঐস্থানে সাহজী-দের 'নাচ-ঘর' ছিল—আমিই বাল্যকালে তথায় কতবার নাচ দেখিয়াছি। চার বিঘা ভূমির উপর তাঁহাদের বাড়ী ছিল। এখন বাঁশবন, বেতবন আর আমবাগান হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে ফৌত হইয়া গেল !

আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—কিসে ফৌত হইল ? আমিও বলিতে প্রস্তুত আছি। আমার জন্মভূমির দুর্দ্দশার কথা বলিব বলিয়াই ঢাক ঘাড়ে করিয়াছি। ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ বা বসন্তের মহামারীতে সাহজীরা ফৌত হয় নাই। হইয়াছে, মানব পশুর পাশবিক অত্যাচারে ! কেবল যে মালীগঞ্জের সাহজীরাই মানব-পিশাচের অত্যাচারে ফৌত হইয়া গিয়াছে তাহা নহে। এদেশের অনেক গ্রামের, অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনীগণ সাহজীদের মত ফৌত হইয়াছে। আমি এখনও দেখাইতে পারি, আজিও কোন বৈষ্ণব বংশের দুইটি বালক, লক্ষপতি হইয়াও পথের ভিখারী হইয়াছে। এ প্রকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

কালিকাপুরের ডচ্‌কুঠি যাহারা লুট করিয়াছিল, মালীগঞ্জের সাহজী-

দের বাড়ীতেই তাহারা ডাকাতী করিয়াছিল! একবার নয়, তিন বার উহারাই ডাকাতী করিয়া সাহজীদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। তাহাদের ডাকাতী করাই ব্যবসা ছিল, নচেৎ সামান্য লোক হইতে সদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থে, আজ তাঁহারা জমিদার হন নাই। ডাকাতীর পয়সায়, অত্যাচারের পয়সায় আজ তিনি বা তাঁহারা বড়লোক, জমিদার হইয়াছেন। ওসব্ পয়সা—ডাকাতীর, চুরির, নরহত্যার দ্বারা উপার্জ্জিত। নরকের অর্থ, অভিশপ্ত অর্থ, অভিশপ্ত সম্পত্তি। ঐ সকল সম্পত্তির মালিক হইয়া কি শান্তি সুখ অনুভব করিতে পারে! নরহত্যা, নারীহত্যা, নরনারী নিগ্রহ, নারীর ধর্ম্মনাশরূপ বিবিধ অত্যাচারে তাহাদিগকে নিয়ত উৎপীড়িত হইতেই হইবে। শান্তি কদাচ পাইবার উপায় নাই! অশান্তির দাবানলে পুড়িয়া মরিতেই হইবে। অসদুপায়ে উপার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর সকল পদার্থের উপর, দুশ্চিন্তা, অশান্তি, উদ্বেগ, যাতনা, অনিদ্রা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যিনি যখন উক্ত সম্পত্তির মালিক হইবেন, তাঁহাকেই শত সহস্র বৃশ্চিকে নিয়ত দংশন করিতে থাকিবে।

পূর্ব্বে আমাদের মালীগঞ্জ হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে, একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে একজন সামান্য গৃহস্থ বাস করিতেন। অবস্থা তত সচ্ছল ছিল না। যাহাই হউক, প্রথমে ছোটখাট চুরি করিতে করিতে সাহস বৃদ্ধি পায়। ক্রমে বড় বড় চুরি আরম্ভ করেন। তৎপরে উক্ত চুরির অর্থে তাঁহারা গ্রামের মধ্যে অর্থশালী হইয়া উঠেন। বলিতে কি, সে গ্রামটি তত বড় ছিল না, বনের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রাম। সেই স্থানেই প্রথমে ডাকাতের দল করেন। কাহাকেও মাহিনা দিয়া, কাহাকেও ডাকাতির অংশ দিবার কড়ারে লোক সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং সর্দ্দার ডাকাত হন।

ক্রমে গোপনে গোপনে ডাকাতী ব্যবসা খুব জোরের সহিত চলিতে থাকে। বাহিরে মহাজনী করেন, তদুপরি নীলকুঠির 'দাওয়ানজী'।

লোকে নীলকুঠির দাওয়ানজীকে বড় ভয় করিত। এই নীলকুঠিটি আমাদের গ্রামের উত্তরে ছিল। 'দাওয়ানজী' মহাশয় সাহজীদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেন। নীলকুঠির দাওয়ানজী বলিয়াই হউক বা ডাকাতদের সর্দ্দার বলিয়াই হউক, অথবা দরিদ্র ছিলেন অর্থশালী হইয়াছেন বলিয়াই হউক, কুলরমণীগণের প্রতি তাঁহার তীব্র দৃষ্টি ছিল—সে দৃষ্টি শনির দৃষ্টি, যাহার উপর পড়িত তাহার মস্তক উড়িয়া যাইত। সাহজীদের কোন কুলবধূর উপর দাওয়ানজীর শনির দৃষ্টি পতিত হইল। সাহজীরাও বড় কেও কেটা ছিলেন না। দুর্দ্দান্ত হইতে পারেন, কিন্তু চোর ডাকাত ছিলেন না। পর-নারীর উপর কখন দৃষ্টিপাত করিতেন না। দাওয়ানজীর কোনটারই অভাব ছিল না। তিনি পাপের সজীবমূর্ত্তি ছিলেন।

একদিন বর্ষাকালে দাওয়ানজীর ডাকাতের দল, সাহজীদের বাটীতে পড়িল বড় সাহজী সে রাত্রে বাড়ী ছিলেন না। ডাকাতের দল যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেল। সেই রাত্র হইতে সাহজীর বড় মেয়েটি ও ছোট বৌকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এই প্রকারের তিনবার ডাকাতী সাহজীদের বাড়ীতে হইয়াছিল। প্রতিবারেই একটি বা দুইটি যুবতীও অপহৃত হইয়াছিল। শেষের ডাকাতীতে সাহজীদের দুই ভাই মারা পড়েন। তাঁহাদের কৃষিক্ষেত্র নীলকুঠির জিম্মায় থাকে। প্রথমে কিছু কিছু খাজনা কুঠির দাওয়ানজী দিতেন—তাহা লোকদেখান, সব মিথ্যা। ক্রমে মিথ্যা দেনার দায়ে, সাহজীদের জমি জমা, বাড়ী ঘর বিক্রয় হইয়া যায়। সাহজীদের বংশে যে দুইচারিজন বিধবা ছিলেন, তাঁহাদিগকে যে কেহ আশ্রয় দিয়াছে, তাহাদের উপরেই দাওয়াজনজীর শুভদৃষ্টি পড়িয়াছিল। শেষে তাঁহারা গ্রামের কাহারও গৃহে আশ্রয় না পাইয়া, বারইয়ারী তলার গম্ভীরামণ্ডপে নিদ্রা যাইতেন; তাহাতেও,

তাঁহাদের নিস্তার ছিল না। শেষে আমার পিতামহ তাঁহাদিগকে আমাদের গৃহে আনয়ন করেন। ইহার পূর্ব্ব দিনে, দাওয়ানজীর আদেশে তাঁহার ভৃত্যগণ রাত্রে রমণী চতুষ্টয়ের পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত জোর জবরদস্তী করিয়া কাড়িয়া লইয়া বিবস্ত্রা করিয়া রাখিয়াছিল। কাহারও সাধ্য হয় নাই যে প্রাতঃকালে একখানি ছিন্ন বস্ত্র দিয়াও তাঁহাদের লজ্জা নিবারণ করে। পিতামহ অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে বস্ত্র দিয়া আমাদের গৃহে আনয়ন করেন—তাঁহারা প্রথমে আসিতে চাহেন নাই—পাছে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলে আমার পিতামহের বিপদ হয়! পিতামহের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, তাঁহারা আমাদের গৃহে আগমন করেন। সেই রাত্রে আমাদের গৃহে আগুন লাগে! যাহা কিছু ছিল পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। আমার এক পিসী ও তাঁহার একটি কন্যা, সেই রাত্রে আগুনে পুড়িয়া মারা যান। তিনি যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরেই আগুন লাগিয়া ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ



কালিকাপুরের ডচ্ কুঠিয়ালের বদান্যতা

"যে দিন হইবে পাপী নির্ভয় অন্তর,
সে দিন আমার হ'বে সবংশে বিনাশ।
বিপদে বেষ্টিত ব'লে মনে বড় ভয়,
আপাততঃ তাই প্রাণ রেখেছে নির্দ্দয়।"

(নবীন)

পিতার নিকট শুনিয়াছি, আমার পিতামহ পরদিন প্রাতঃকালে কালিকাপুরের কুঠিয়াল সাহেবের নিকট গমন করেন। নীলকুঠির দাওয়ানজীর অত্যাচারের কথা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় অবগত করাইয়া মেমসাহেবের পা দুখানি ধরিয়া কৃপাভিক্ষা প্রার্থনা করেন। শ্বেতাঙ্গিনী রমণী, রমণী-নিগ্রহের কথা অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হন, এবং আমার পিতামহকে অভয় দান করেন। এই কুঠির সাহেব অর্থ উপার্জ্জনের জন্য এদেশবাসীগণের উপর যে অত্যাচার না করিতেন তাহা নহে। কিন্তু নীলকুঠির সাহেবগণের মত বর্ব্বর

ছিলেন না। তাঁহার দয়া ছিল, রমণীগণের প্রতি কখন অত্যাচার করেন নাই। তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া কেহ কখন বঞ্চিত হয় নাই। মেমসাহেবের দয়ায়, সাহেবের অনুগ্রহে, এক দিবসের মধ্যেই আমাদের দুইখানি বাসগৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল। পিতামহ সেই দিন হইতে কালিকাপুরের ডচ্‌কুঠির দালাল নিযুক্ত হইলেন। নীলকুঠির সাহেবের সহিত এই কুঠিয়াল সাহেবের সদ্ভাব ছিল। তিনি নীলকুঠির সাহেবকে বলিয়া যাহাতে দাওয়ানজী মহাশয়, আমাদের উপর আর কোনরূপ অত্যাচার না করেন, তাহার উপায় বিধান করিয়াছিলেন। এক বৎসর পরে নীলকুঠির সাহেব বসন্তরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার স্থানে নূতন একজন যুবক সাহেব কুঠিয়াল নিযুক্ত হন। তাঁহার সহিত ডচ্ কুঠিয়াল সাহেবের সদ্ভাব ছিল। শুনিয়াছি ডচ্‌কুঠিয়ালের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়! এই বিবাহের পর, নীলকুঠীর দাওয়ানজী কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তখন তিনি লক্ষপতি হইয়াছিলেন। দেশের জনগণ তাহাকে ভক্তি করিত। দেশের ধনী মহাজনগণ দাওয়ানজীকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন, অবশ্য সেটা ভয়ে ভক্তি। তত্রাচ দাওয়ানজী তাহাদের বাড়ীতে ডাকাতী করিতে ছাড়িতেন না। দেওয়ানজীর তিনখানি বড় বজরা ও তিনখানি বড় দ্রুতগামী ছিপনৌকা ছিল। উহা বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হইত, জনসমাজে ইহাই প্রকাশ ছিল; কিন্তু উক্ত নৌকাগুলির সাহায্যে তিনি ডাকাতী করিতেন। তাঁহার অধীনে একশত বলিষ্ঠ লাঠিয়াল ছিল। তাহাদের সাহায্যে দাওয়ানজী ডাকাতী করিতেন।

দাওয়ানজীর ভীষণ ক্রোধ ভিতরে ভিতরে ডচ্‌কুঠিয়াল সাহেবের উপর পতিত হইল। কুঠিয়াল সাহেবকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গোপনে গোপনে চেষ্টা করিতেন। কুঠিয়াল সাহেব তাহা বুঝিতেন, কিন্তু দুইটি কুঠিয়াল সাহেবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দাওয়ানজী কিছুই করিয়া

উঠিতে পারিতেন না। পিতামহ, আশ্রয়দাতা সাহেবের উন্নতির জন্য প্রাণপণে কার্য্য করিতেন, তাঁহার কর্ম্মতৎপরতা ও প্রভুভক্তি দর্শনে সাহেব ও মেম তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। পিতার নিকট শুনিয়াছি মেমসাহেব, মধ্যে মধ্যে মালীগঞ্জে আমাদের বাড়ী আসিয়া, বাড়ীর মেয়েদের সহিত আলাপ আপ্যায়িত করিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে পূজাপর্ব্ব উপলক্ষে উপঢৌকন পাঠাইয়া দিতেন। কুঠিয়াল সাহেবদ্বয়ের কল্যাণে, দাওয়ানজী আমাদের উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহসী হইতেন না। আমাদের গ্রামের লোকনাথ দাসের বাড়ীতে এক রাত্রে ডাকাত পড়িয়া, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। ডাকাতী করিয়া প্রত্যাগমন কালে, গ্রামে আগুন লাগাইয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে গ্রামের অর্দ্ধেক বাড়ী পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়। কয়েকটি নরনারী ও শতাধিক গরু বাছুর পুড়িয়া মারা যায়।

এই ঘটনার একমাস পরে, কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে কুঠির মাল খরিদ জন্য বহু টাকা আসে। চৈত্র মাস, সন্ধ্যার পর কুঠির সিপাহীগণ বন্দুকগুলি তাহাদের গৃহের সম্মুখে রাখিয়া রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ একদল ডাকাত নিঃশব্দে তথায় প্রবেশ করিল এবং বন্দুকগুলি অধিকার পূর্ব্বক তরবারি চালনা করিতে করিতে সিপাহী-দিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। এবং মালখানায় প্রবেশ করিয়া কুড়ালিদ্বারা সিন্দুক ভগ্ন করিয়া সমুদায় টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। কুঠির কয়েকজন দেশীয় কর্ম্মচারী, বাধা প্রদান করিতে গিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সাহেব ও মেম সেই সময়ে মালীগঞ্জস্থ নীলকুঠির সাহেবের বাঙ্গালায় অবস্থান করিতেছিলেন। ডাকাতীর সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র নীলকুঠির সাহেবসহ কালিকাপুরের কুঠিতে আগমন করেন। ঠিক সেই সময়ে ডাকাতদের দল নীলকুঠির উপর পতিত হইয়া মালখানা লুণ্ঠন

করে। দাওয়ানজী তৎক্ষণাৎ কালিকাপুরের কুঠিতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের বিপদে যৎপরোনাস্তি দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক, ডাকাতগণকে ধৃত করিবার জন্য সাহেবদ্বয়ের সহিত ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে থাকেন।

এই ঘটনার পর ডচ্কুঠির সাহেব যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া পড়েন। ক্রমে কুঠির অবস্থা মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। সাহেব ও মেম, এই ঘটনার ছয়মাস পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। কুঠি কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের গ্রামের নীলকুঠি উঠিয়া ছয়ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার নিকট যায়। নীলকুঠি উঠিয়া যাইবার একমাস পরে, আমাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে। ডাকাতেরা আমার পিতামহকে খুন করিয়া যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক চলিয়া যায়। সেই রাত্র হইতে আমার ছোট পিসীমার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অগ্নিদাহে গ্রামের অর্দ্ধেক গৃহ ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। আমার পিতা ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। আমাদের জাতিরা পিসীমার নিরুদ্দেশ ব্যাপার লইয়া আমাদিগকে 'একঘরে' করে। পিতামহের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ মিলিল না। শেষে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদের জাতি রক্ষা করেন। তাঁহার আর কেহই ছিল না। সুতরাং তিনি নির্ভয়ে আমাদের জাতি রক্ষা করিয়া ছিলেন।

পিতামহের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপনান্তে, রাত্রে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজ গৃহে গিয়া শয়ন করেন। দ্বিপ্রহর রাত্রে তাঁহার দ্বারদেশের বহির্ভাগে রাশি-কৃত খড় জমা করিয়া, কে বা কাহারা অগ্নি সংযোগ করিয়া দেয়। বৃদ্ধ পরোপকারী ব্রাহ্মণ, গৃহ হইতে বহির্গত হইতে না পারিয়া অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া মারা যান। সেই রাত্রে আমাদেব গ্রামের দীননাথ মণ্ডলের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে। তাঁহার গৃহে ধান্য বিক্রয়ের দুই হাজার টাকা, সেইদিন গোলা হইতে আনা হইয়াছিল। উহা ডাকাতগণ লইয়া যায়। ডাকাতীর পর তাঁহার যুবতী স্ত্রী রাধারাণীর আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ব্রাহ্মণের

গৃহের অগ্নি ক্রমশঃ গৃহের পর গৃহ দগ্ধ করিতে করিতে, প্রায় গ্রামের সিকি আন্দাজ গৃহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। দীননাথ মণ্ডল, জাতিতে গণেশ। সমাজ তাহাকে 'একঘরে' করে। আমার পিতা ও দীননাথ দুইজনে একটি দল করেন।

মালীগঞ্জের প্রতি ধনীর গৃহ, এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে লুণ্ঠিত হইতে থাকে; এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে যুবতী রমণী হরণ ব্যাপার নিত্যনৈমিত্তিক কাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত হয়। বিদেশী মহাজনগণ মালীগঞ্জ ত্যাগ করিয়া বংরেজাবাদে চলিয়া যান। দেশের ধনীগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অল্পদিবসের মধ্যে দরিদ্র কৃষকরূপে পর্য্যবশিত হইয়া যায়। সেই সময়ে আমার জন্ম হয়। জন্মের নয়মাস পরে পুনশ্চ আমাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে। যাহা কিছু ছিল তাহা ডাকাতগণ লইয়া যায়। ধান, চাল যাহা ছিল তাহা অগ্নিদগ্ধ হইয়া যায়। সেই রাত্র হইতে আমি আর মাতৃস্তন্যপান করি নাই। মা নিরুদ্দেশ হন।

বর্ব্বর স্বদেশবাসীর পৈশাচিক অত্যাচারে, সোনার বাঙ্গালার কতশত পল্লী যে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে, কতশত পরিবার যে পথের ভিখারী হইয়াছে, কতশত সতী রমণীর যে সতীত্ব অপহৃত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আজ সেই বর্ব্বর বংশাবতংশের পুত্র পৌত্রেরা ধর্ম্মবিগর্হিত অন্যায় অত্যাচারলব্ধ অর্থে ধনী ও মানী হইয়াছেন! তাঁহাদের ধনের প্রতি কপর্দ্দকে প্রেতাত্মা বিরাজ করিতেছে। সতীর অগ্নিময় কোপাগ্নি দপ্ দপ্ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। বহু নরনারী ও পরোপকারী ব্রাহ্মণের শোনিতে, প্রতি কপর্দ্দক রঞ্জিত রহিয়াছে। যিনি সেই অর্থে হস্ত প্রদান করিবেন, যিনি সেই অধর্ম্মার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির আধিপত্য লাভ করিবেন, তাঁহাকেই শত শত নরনারীর অগ্নিময় অভিশাপে উন্মাদবৎ করিয়া তুলিবে। ঈশ্বর আছেন!

সৃষ্টিকর্ত্তার কোপে সেই অর্থ অভিশপ্ত! সাধ্য কি, সেই পাপ অর্থে ভোগীর শান্তি উৎপাদন করে! যিনি সেই অর্থের অধিকারী হইবেন তাঁহাকেই সহস্র বৃশ্চিকে হৃদয় ছিঁড়িয়া ফেলিবে। ইহাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ



দাওয়ানজীর শেষ

"এইকালে এতবিষ ! পূর্ণ কলেবর
হবে যবে এ ভুজঙ্গ, না জানি তখন
হবে কিবা ভয়ঙ্কর তীব্র বিষধর।
নাশিবে নিশ্বাসে কত মানব জীবন !"

(নবীন)

আমাদের মালীগঞ্জ সাধে কি মরুভূমি হইয়াছে! বর্ব্বরগণের অত্যাচারে মালাগঞ্জ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। সতীর অগ্নিময় নিশ্বাস, আজিও মালীগঞ্জের বাঁশঝাড়ের মধ্য হইতে ঘুর্ণাবর্ত্তের ন্যায় উত্থিত হইয়া পাপিষ্ঠ দাওয়ানজীর বংশধরগণের আবাস ভবনের অভিমুখে ছুটিতেছে। পরোপকারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অগ্নিময় আত্মা তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঐ দিকেই মুষ্টিবদ্ধ ভাবে ছুটিয়াছে। মালীগঞ্জ গঞ্জ-গোলাবিভূষিত নন্দন ভূমি ছিল। আজ দেখুন—বনের মাঝে কেবল শ্মশান! কেবল শ্মশান! বঙ্গের পল্লীগুলির ধ্বংসস্তূপ দেখিয়া যদি অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছা থাকে, আসুন আমার জন্মভূমি দেখিবেন আসুন! আমার জন্মভূমি মালীগঞ্জ সুন্দর, অতি সুন্দর! মালীগঞ্জ—প্লেগ, ওলাউঠা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া বা জল প্লাবনে শ্মশান হয় নাই। দৈব কর্ত্তৃক শ্মশান হয় নাই! নর-পিশাচ কর্ত্তৃক পুণ্যভূমি কলুষিত হইয়াছে। ভূতের দেশ! কবরের দেশ! শ্মশান! মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে!

অত্যাচারী দুর্বৃত্ত নরাধম দাওয়ান পাপের একটি জ্বলন্ত মূর্ত্তি। ছলে, বলে দেশের ও দেশবাসীর যে কত সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। মিথ্যা, জালজুয়াচুরী যে কত করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। জাল দলিল করিয়া, নিরীহ লোকের ভিটামাটি উৎসন্ন করিয়াছেন। জাল দাস-খত লিখিয়া জোর জবরদস্তি করিয়া, কত লোককে আজীবন গোলামী করাইয়াছেন। অত্যাচারীর অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণ হইলেই, তাহার পাপ-ময় জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। জীবনকালের দুষ্ক্রিয়াজনিত উপার্জ্জিত-অর্থ দ্বারা, জীবনে সে কখন সৌভাগ্যশালী হইতে পারে না। চিত্তের শান্তি থাকে না। পাপকার্য্য ব্যতীত ক্ষণমাত্রও সে তিষ্ঠিতে পারে না। পাপ পাপের আকর্ষণে পাপের পথেই লইয়া যায়। জীবনের শান্তি বিধানার্থ যতই চেষ্টা করে, অশান্তির অগ্নিময় ঝটিকাবর্ত্ত প্রবল বিক্রমে ভীষণ গর্জ্জনে, তাহার চতুর্দ্দিকেই ঘূর্ণিত হইতে থাকে। পাপচিন্তায় হৃদয় ধীরে ধীরে তুষানলে দগ্ধ হইতে থাকে। রক্তের তেজ চিরকাল থাকে না। যৌবনে যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, বার্দ্ধক্যে তাহার সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। দাওয়ান বৃদ্ধ হইয়াছেন—বয়সে তত বৃদ্ধ হন নাই—পাপচিন্তায় তাঁহাকে বৃদ্ধ করিয়াছে। অশান্তির অগ্নিজ্বালায়, হৃদয় নিয়ত শত শত বৃশ্চিকে দংশন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভগবান, ডাকাত নরঘাতক দাওয়ানের দেহে শূলরোগ প্রদান করিয়াছেন। হৃদয়ের পঞ্জরগুলি এক এক খানি করিয়া গণনা করা যাইতেছে। উদর ও বক্ষে গৃহদাহের অগ্নিশিখা নিয়ত প্রজ্বলিত হইতেছে—কেবল 'জ্বলে মলুম্! জ্বলে মলুম্!' রবে চীৎকার করিতেছেন। বাহিরে ঘৃত মালিশ করিলে কি ভিতরের অভিশপ্ত পাপাগ্নির দাহিকাশক্তি হ্রাস হইতে পারে! কখনই নয়! পাপীর শাস্তি আরম্ভ হইয়াছে।

সমস্ত শরীর জীর্ণ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে রক্ত বমি হয়। তত্রাচ

পাপের প্রলোভনে মজিয়া রহিয়াছেন। দুনিয়ার আশা, এখন হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, পাপচিন্তা এখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কবে কোন দণ্ডে মরিবেন, তত্রাচ লোকের সর্ব্বনাশ করিতে ব্যস্ত। দুষ্টপাপবুদ্ধিতে হৃদয় পূর্ণ। সোনার দেশটা এই প্রকারের পিশাচগণের তাণ্ডব নৃত্যে উৎসন্ন হইতেছে। তাহারা ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা হইতে অতি ভীষণ। তাহারা বর্ব্বর। আমাদের দেশে এই প্রকার বর্ব্বর কুলাঙ্গারেব অভাব নাই। সরল, পল্লীবাসীগণের মধ্যে, এই প্রকারের হিরণ্যকশিপু গুলা জন্মগ্রহণ করিয়া যে, কত পল্লীর ধ্বংস সাধন করিয়া গিয়াছে ও করিতেছে তাহা কে বলিবে! আজিও যে এই প্রকারের দৈত্যগণের অভাব ঘটিয়াছে তাহা নহে। কিন্তু দেশ আর পূর্ব্বের মত নাই। তত্রাচ দিনে ডাকাতী করিবার মত নরপিশাচের অভাব আদৌ নাই। তাহারা মিছরিব ছুরি—বাহিরে সাধু, ভিতরে দস্যু! 'বাজকে বাজ কবুতর্‌কে কবুতর্'! ইহারাই গোবধ করিয়া জুতা দান করে। প্রজার সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া দাতব্য করে। বাহিরের লোকের নিকট যশস্বী হইতে চাহে। দাওয়ানজীর বর্ত্তমান গদীর মালিকও এই রকমের লোক।

আমি যখন বালক, অনাথ তখন হইতে আমার বাল্যবন্ধু, উভয়েরই বয়স সমান, উভয়ে একত্রে থাকিতাম, অনাথের মাকে আমি মা বলিতাম। আমাদের পল্লীর পশ্চিমের কোদলবাথানের ঝিলে মাছ ধরিতাম—নৌকা ফিনিস যাইতে দেখিতাম। একদিন অনেকগুলি নৌকায় সুসজ্জিত আরোহীগণকে দেখিয়া মনে হইল, আজ বুঝি কোন উৎসব উপলক্ষে মেলা বসিয়াছে, এবং সেইজন্য এই সকল নৌকা তথায় যাইতেছে। আমি বাড়ী গিয়া পিতাকে এই উৎসবের কথা বলিলাম—যাইবার জন্য জেদ করিলাম। পিতা বলিয়াছিলেন—"বাবা। আমার পক্ষে যথার্থই উৎসবের দিন বটে, তোমার পক্ষেও বটে, আর এই পল্লীবাসীর পক্ষেও মহোৎসবের

দিন বটে। তাহা ছাড়া এতদঞ্চলের শত পল্লীর উৎসবের দিন ও বটে। আর একটু বড় হও, আর একটু জ্ঞান হউক, তোমাকে এই উৎসবের গূঢ় রহস্য বলিব। এখন বুঝিয়া রাখ, আজ দাওয়ানজীর আত্মশ্রাদ্ধ—ভূতের শ্রাদ্ধে কি যাইতে আছে! বিশেষ আমাদের নিমন্ত্রণ নাই!" পিতার চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল, আমাকে কোলে করিয়া গণ্ডে চুম্বন করিলেন। সেইদিনের কথা ও আমার পিতার মুখভাব আজিও আমার একটু একটু মনে পড়ে।

অনাথের মাতার নিকট শুনিয়াছি, দাওয়ানজীর কেহ নাম করে না। বলে ও নাম করিলে অন্ন জুটেনা—যেখানে ওর নাম হয়, সেখানে ভূতের ভয় হয়, সে স্থানের সাত হাত মাটি অশুদ্ধ হইয়া যায়, বাড়াভাতে ছাই পড়ে, পাড়া প্রতিবাসীর সহিত ঝগড়া হয়। বিশেষ আমাদের পল্লীর স্ত্রীলোকেরা দাওয়ানের নাম দৈবাৎ শ্রবণ করিলেও বাম পায়ের তিনবার লাথি ভূমিতে মারে। ঝাঁটা তিনবার মাটিতে ঠেকায়। আর দূর দূর করিয়া দাওয়ানজীর মহিমা কীর্ত্তন করে। দাওয়ানের মৃত্যুর পর, দেশের লোকে বলিত—'আপদ মল, হাড় জুড়াল এতদিনে'। কেহ মরিলে দেশের লোকে 'আহা' করে, দাওয়ানের মৃত্যুতে—'আপদ গেল' বলিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহাদের মধ্যে কে সৎ, কে অসৎ অক্লেশে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর কেহ বা স্বর্গে গিয়াছেন, আর কেহ বা নরকে বিষ্ঠার কৃমি হইয়াছে তাহাও বুঝা যায়।

দুষ্ট দাওয়ানের মৃত্যুর পর, দেশের লোকে মনে করিল দাওয়ানের উপযুক্ত পুত্র অনেকটা ভাল হইলেও হইতে পারেন, তবে—'বাপকো বেটা, সিপাইকো ঘোড়া, কুচনেই হোয় তভি থোড়া থোড়া'—এই প্রকারে আধা হিন্দী, আধা বাঙ্গলা কথা বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে চলিত আছে। বাপের বেটা বাপের মতই হয়—যদি বাপের মত কোন কিছুই না হয়, তবে

জন্মের দোষ আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস হয়। দাওয়ানজীর পুত্রের নাম ভগবানপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

'রায়চৌধুরী' খেতাবটী বংশগত উপাধি নহে, উহা স্বকৃত উপাধি। দরিদ্রের অর্থ হইলে উপাধিরও পরিবর্ত্তন হয়। প্রথমে ছিল উপাধি দাস, তখন ছিলেন পাটোয়ার—তাহার পর পিতার ডাকাতীলব্ধ অর্থে কিছু ধন সম্পত্তি বৃদ্ধির সহিত দাস ঘুচিয়া হয় 'চৌধুরী'। দাওয়ান চৌধুরীর মৃত্যুর পর, ভগবানপ্রসাদ চৌধুরী ফাঁকি দিয়া একটি জমিদারী ক্রয় করেন—জমিদারী ক্রয়ের দলিলে নাম লেখান হইল শ্রীল শ্রীযুক্ত ভগবান প্রসাদ রায়চৌধুরী—সেই হইতে এই বংশ 'রায়চৌধুরী' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ভগবানপ্রাসাদ জাতিতে 'কালাল' বা শৌণ্ডিক। এখন আর কালাল নাই, হইয়াছেন চাষি-কৈবর্ত্ত, নবশাক বলিয়া তাঁহাদের জল হিন্দু সমাজে চলিত হইয়া গিয়াছে। শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীগণ তাঁহার জল পবিত্র বোধে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। কালের এমনি মাহাত্ম্য যে, যাহাদের জল পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে চলিত, এখন তাহাদের অর্থ, বল, বিক্রম না থাকাতে তাহাদের জল অচল হইয়াছে। গণেশের জল চলিত ছিল—এখনও চলে, কিন্তু রায়চৌধুরীর খয়েরখাঁদের মধ্যে, এখন কেহ কেহ গণেশের জল অচল করিতেছেন! গণেশজাতি নরহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করে নাই—সতীর সতীত্ব নাশ করে নাই—তাহারা অধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থে জমিদার নহে—ক্ষুদ্র দরিদ্র জাতি—বিনয়ী, নম্র সেই কারণে তাহাদের জল ক্রমশ অচল হইতেছে। দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন কি এই প্রকারই হয়!

যখন ভগবানপ্রাসাদ রায়চৌধুরী মহাশয় জমিদার—দুর্দ্দান্ত জমিদার, আমি সেই সময়ে আমাদের মালীগঞ্জের ক্ষুদ্র পাঠশালায় পড়ি। পণ্ডিতটি আমাদের গণেশ জাতীয়। তখন আমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন।

জমিদার মহাশয় নূতন জমিদারীর বন্দোবস্ত করিতেছেন। প্রতি প্রজার উপর, টাকায় টাকা জমিদারী ক্রয়ের মাঙ্গন স্বরূপ আদায় হইতেছে। যাহার পাঁচ টাকা মালগুজারী লাগিত, তাহাকে এইবার দশ টাকা দিতে হইতেছে। না দিলে ভীষণ উৎপাত—এই প্রকারে ভগবানপ্রসাদ পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনাদায়ী প্রজার বাড়ীতে, দশজন লাঠিধারী ভীষণাকার পাইক হাজির হইয়া প্রজাকে কাণে ধরিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। জমিদারের কাছারী বাড়ী নিয়ত প্রজার ক্রন্দনে, প্রজার আর্ত্তনাদে মুখরিত হইয়া উঠিল—অনাদায়ী দেনদার প্রজায় পূর্ণ হইতে লাগিল। কাছারীর দেউড়ীতে ফরমাইস দেওয়া 'শওয়া হাতের নাগরা জুতা' ঝুলিতে আরম্ভ করিল। বর্দ্ধিত হারে যাহারা রাজস্ব দিতে অপারগ, তাহাদিগকে ধরিয়া পাইকগণ উক্ত শওয়া হাতের নাগরা জুতাদ্বারা পটাপট্ আঘাত করিয়া পিঠ ফাটাইয়া রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিতে আরম্ভ করিল। প্রাণের ভয়ে যথাসর্ব্বস্ব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, জমিদারের খাজনা সুদে আসলে শোধ করিতে আরম্ভ করিল। কেবল যদি দ্বিগুণ কর দিয়া, প্রজা রক্ষা পাইত তাহা হইলে কোন চিন্তাই থাকিত না। তাহার উপর অনেকগুলি বাব্ ছিল শুনিয়াছি—হাতী মাঙ্গন, ঘোড়া মাঙ্গন, আসবাব্ মাঙ্গন, পূজারি মাঙ্গন, দুধ মাঙ্গন, প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গন রূপে অতিরিক্ত বহু টাকা সংগৃহীত হইত। আপনারা কি, ঐ সকল মাঙ্গনের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন? না বুঝিয়া থাকেন, মাঙ্গনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি, ধীর মনে শ্রবণ করুন।

জমিদার হস্তী ক্রয় করিয়াছেন, সুতরাং প্রজাদিগকে টাকা প্রতি আট আনা হস্তী ক্রয়ের ভিক্ষা স্বরূপ দিতে হইবে। ঘোড়া মাঙ্গনও ঐ প্রকার। আসবাব পত্রের মাঙ্গনও ঐ প্রকার। জমিদার মহাশয় বার

মাসে তের পার্ব্বণ করেন। দোল, দুর্গোৎসব করেন, তাহার খরচ বাবত টাকা প্রতি যে মাঙ্গন দিতে হয় উহার নাম 'পূজারী মাঙ্গন'। দুধ মাঙ্গন—জমিদার দুধ খাইবেন—গাভী ক্রয়ের জন্য প্রজা মাঙ্গন দিবে। এই প্রকারের আট দশটা মাঙ্গন ছিল। সুতরাং মূল রাজস্ব হইতে কত টাকা অধিক প্রজাদিগকে দিতে হইত তাহার বিচার করুন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ



নায়েব গৌরাঙ্গ চৌধুরী

"আমি হবনা ভাই নববঙ্গের নব যুগের চালক,
আমি জ্বালাবনা আঁধার দেশে সুসভ্যতার আলোক ;
যদি ননী ছানার গাঁয়ে কোথাও অশোক নীপের ছায়ে
আমি কোন জন্মে পারি হতে ব্রজের রাখাল বালক।"

(রবীন্দ্র)

আমি এখন একটু বড় হইয়াছি। বুদ্ধি একটু মাথায় দাঁড়াইয়াছে। সুখ দুঃখের স্বাদ অনুভব করিতে শিখিয়াছি—কিন্তু এখন সাথীদের সহিত ধূলা খেলা করি, হিঙ্গেদাড়ি, চেল্ কপাটী খেলি, গরু চরাই আবার পাঠশালায় গিয়াও লেখাপড়া করি। 'শিশুবোধ' শেষ করিয়াছি। চাণক্যের শ্লোক আমার মুখস্থ হইয়াছে। ভবিষ্যতে পাটোয়ারী করিতে পারিব এই রকমের লেখাপড়া পাঠশালায় চলিতেছে। 'সেবকশ্রী' হইতে 'কস্য কর্জ্জ পত্র মিদং' ইত্যাদি লেখা সমাপ্ত হইয়াছে। জমা-ওয়াশীল-বাকি শিক্ষা চলিতেছে। জমিদারী মহাজনীর উপযুক্ত বিদ্যা, পল্লী পাঠশালার শেষ বিদ্যা, ইহার পর আর কিছুই নাই। ইহাই তখনকার 'রাইচাঁদ প্রেমচাঁদ।' তখন দেশে জমিদারী ও মহাজনী, বাজার হিসাব শিখিলেই কর্ম্ম মিলিত। এখনকার স্কুল কলেজের বিদ্যাটা, উন্নত গোছের হইলেও ঐ রকমের গোলামী

বিদ্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এখনকার বিংশশতাব্দীর কেতাবী বিদ্যাটা তখনকার পাঠশালায় বিদ্যার আয়তন বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাহাই হউক, আমার পাঠশালার বিদ্যাটা প্রায় সমাপ্তের দিকেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দু দশ দিন পরে, হয় আমি পাটোয়ার, না হয় মহাজনের সেরেস্তায় প্রবেশ করিয়া, তিন বা চারি টাকা মাসিক বেতনের কার্য্য পাইব এমত আশাও পাইতেছি। অনাথের মাতার নিকট শুনিতাম—পাঁচ টাকিয়া পুরুষের কথা। যেদিন অনাথ বাড়ীতে গিয়া কোন কাজ কর্ম্ম করিত না—এটা দাও ওটা দাও করিত, সেই দিন অনাথের মাতা অনাথকে বলিতেন—'যেন পাঁচ টাকিয়া পুরুষ এলেন!' আমি একথা অনেক বার শুনিয়াছি—কিন্তু শিশুবোধে, চাণক্যশ্লোকে, জমিদারী, মহাজনী বা বাজার হিসাবের মধ্যে—'পাঁচ টাকিয়া পুরুষ' সম্বন্ধে কোন কথাই পড়ি নাই বা গুরু মহাশয়ও বলিয়া দেন নাই। অনাথের মা, আমাকে এই বাক্যের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। আপনাদিগকে উহার ভাবার্থ বুঝাইয়া দিব মনে করিয়াছি। অশিক্ষিতা পল্লী-রমনীর ব্যাখ্যাটাকে ছোট মনে করিবেন না। ইহাই বঙ্গের কৃতীযুগ-লক্ষণ ব্যক্ত করিবে। ইংরাজীতে যাহাকে স্বর্ণ-যুগ বলে, ঐ পাঁচ টাকিয়া পুরুষের ব্যাখ্যার মধ্যে সেই স্বর্ণ যুগমাহাত্ম্য গুপ্ত রহিয়াছে।

'পাঁচটাকিয়া পুরুষ'

অনাথের মাতার নিকট অনাথ ও আমি অনেক গল্প শুনিতাম। আজ 'পাঁচটাকিয়া পুরুষের' গল্প হইতেছে। অনাথের মা বসিয়া গল্প করিতেছেন, অনাথ ও আমি দুই বন্ধুতে গল্প শুনিতেছি। কালিকাপুর একটা গণ্ডগ্রাম, গ্রামে দুইজন ধনী মুসলমান বাস করিতেন। তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। এ অঞ্চলে তাঁহাদের জমিদারী ছিল। তাঁহারা

হিন্দুর দেবতা ও হিন্দুর পীর ব্রাহ্মণদিগকে বড় ভক্তি করিতেন। দেশের লোকে তাঁহাদিগকে বড়ই ভক্তি ও মান্য করিত। কালিকাপুরের মধ্যস্থলে তাঁহাদের সুবৃহৎ দ্বিতল বাস-ভবন ছিল। পলাশীর লড়াই হইবার পর, তাঁহারা এদেশে পলাইয়া আসিয়া বিলের মধ্যে বাস করেন। তখন এই বিলের মধ্যে একটি কালীবাড়ী ছিল। তাঁহারা কালীবাড়ীর অনতিদূরে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। কালীমাতার নাম শরণ করিয়া তাঁহারা এই নূতন গ্রামের নাম 'কালিকাপুর' রাখেন। তাঁহার সহিত দুইঘর সুবর্ণবণিক এদেশে আসিয়াছিলেন—কোম্পানীর লোকে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল। যাহা পুঁজি ছিল, তাহা লইয়াই তাঁহারা পলাইয়া আসিয়াছিলেন। একজন ভৃত্যও তাহাদের সহিত পলাইয়া আসিয়াছিল। তাহার স্ত্রী রূপসী ছিল, কোম্পানীর একজন নায়েব, তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া নিজের গৃহে দিনকয়েক আটক রাখিয়াছিল। পরে কুঠির ছোট সাহেবকে ঐ যুবতীকে দান করে। ছোট সাহেব তাহার জাতি লইয়াছিল, এবং তাহাকে তাঁহার কুঠিতে মাসকয়েক রাখিয়াছিল। তাহার স্বামীর নাম জগন্নাথ। জগন্নাথ বড় ভাল লোক ও ধার্ম্মিক ছিল।

এক দিন জগন্নাথের স্ত্রীকে লইয়া, কুঠির ছোট সাহেব ফিনিসে চাপিয়া কালিকাপুরের কুঠিয়াল সাহেবের সহিত দেখা করিতে আসে। কোদাল-বাদার গঞ্জের ঘাটে, সাহেবের বজরা বাঁধা হয়। জগন্নাথ তখন ঐ গঞ্জের ঘাটেই স্নান করিতেছিল। তাহার স্ত্রী জলদা, বজরার ভিতর হইতে তাহার স্বামীকে দেখিতে পায়। স্বামীকে দেখিয়া তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। সাহেব সেই সময়ে মালাগঞ্জের নীলকুঠির সাহেবের কুঠিতে গিয়াছিলেন। বজরায় লোকজন বড় ছিল না। জলদা, ধীরে ধীরে বজরা হইতে জলে নামিল, এবং কোদলাবাদার জলে গলা ডুবাইয়া বসিয়া রহিল। পরে

স্বামীর অজ্ঞাতসারে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কালিকাপুরে পলাইয়া যায়। স্বামী জগন্নাথ, খাঁ সাহেবদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলে, জলদাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করে। জলদা কাহাকেও কিছু না বলিয়া, একেবারে খাঁ সাহেবের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। খাঁ সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা, জলদাকে চিনিতে পারিল। জলদা কাঁদিয়া কাটিয়া খাঁ সাহেবের স্ত্রীর পা ধরিয়া আশ্রয় চাহিল। খাঁ সাহেব জলদার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া কাঁদিয়াছিলেন। জলদা, খাঁ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীকে তাহার উপর যত অত্যাচার হইয়াছিল তৎ সমুদায় বলে, এবং সাহেব জোর জবরদস্তি করিয়া তাহার যে ধর্ম্মনাশ করিয়াছে সে কথা বলিতে ভুলে নাই। জলদা এখন চারিমাস গর্ভবতী হইয়াছে। জগন্নাথ, স্ত্রীকে দেখিয়া পাগলের মত হইয়া যায়। জগন্নাথ তাহার স্ত্রীকে ঘরে লইয়াছিল। পরে তাহারা এই মালীগঞ্জে বাড়ীঘর করিয়া বাস করিতে থাকে। সাহেব জলদার অনেক অনুসন্ধান করিয়া ছিল, কিন্তু না পাইয়া মুরশীদাবাদে চলিয়া যায়। পথে ঝড় তুফানে সাহেবের নৌকা ডুবি হয়, এবং সাহেব জলে ডুবিয়া মারা যায়।

জগন্নাথ মাথা মুড়াইয়া বৈরাগী হয়, জলদাও তাহার সহিত বৈষ্ণবী হয়। ঐ কদমতলায় জগন্নাথের ঘর ছিল। মাথা মুড়াইয়া বৈরাগী হইবার পর, জগন্নাথের নাম 'কুঞ্জদাস' ও জলদার নাম 'মালতী' হয়। কুঞ্জদাস ও মালতীর স্বভাব খুব ভাল ছিল। কুঞ্জদাস তাহার বাড়ীর উঠানে একটী কদম্বগাছ রোপণ করিয়া তাহার তলায় মালতীলতা রোপণ করে। সেই হইতে ঐ আখড়ার নাম—'মালতী-কুঞ্জ' হইয়াছে। কুঞ্জদাস ও মালতী, কেহই এখন জীবিত নাই। মালীগঞ্জে বাস করিবার পর, মালতীর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহাকে দেখিতে সাহেবের মত ধপ্‌ধপে শাদা। কুঞ্জদাস, তাহার নাম গৌরাঙ্গ রাখে। গৌরাঙ্গ

বাবাজী এখনও জীবিত আছেন। আমি গৌরাঙ্গ বাবাজীকে চিনি, তাঁহার সহিত আমার আলাপ আছে। তাঁহার সাবেক ঘর এখন নাই—খাঁ সাহেব, কুঞ্জদাসকে পঁচিশ বিঘা লাখরাজ জমি দিয়াছিলেন। সেই জমি হইতে প্রথম প্রথম গৌরাঙ্গের ভরণপোষণ চলিত। গৌরাঙ্গ লেখা পড়া শিখিয়া প্রথমে দুই টাকা বেতনে খাঁ সাহেবদের গমস্তা হন।

এখন তাঁহার মাহিনা পাঁচ টাকা। তিনি এখন কোদালা বাথানের জমিদার ভগবানপ্রসাদ রায়চৌধুরীর নায়েব হইয়াছেন। মালতীকুঞ্জে আর বড় থাকেন না। রহমৎগঞ্জের ডিহীতে থাকেন। তাঁহাকে জমিদার ভগবানপ্রসাদ রায়চৌধুরী ভয় করেন। গৌরাঙ্গ পাঁচটাকা বেতনে কাজ করিয়া মহাজনী করেন, চল্লিশ পঞ্চাশজন লাঠিয়াল রাখিয়াছেন, পাঁচশত বিঘা জমি করিয়াছেন। তাঁহার প্রতাপ দেখে কে! স্বয়ং জমিদার তাঁহার নিকট জোর করিয়া কোন কথাই বলিতে পারেন না। জমিদারের আমলারা তাঁহাকে ভয় করিয়া চলে। গৌরাঙ্গ এখন বাবাজী নহেন। গৌরাঙ্গ চৌধুরী হইয়াছেন। রহমৎগঞ্জের হাজার ঘর মুসলমান প্রজা গৌরাঙ্গের মুঠার মধ্যে। গৌরাঙ্গ এক প্রকার তাহাদের রাজা হইয়া বসিয়াছেন।

রহমৎগঞ্জের একজন ধনী বৈষ্ণবের বাড়ী দাওয়ানজী লুট করিয়াছিলেন। সেই বৈষ্ণবের এক নাতনীকে গৌরাঙ্গ চৌধুরী মালাচন্দন না করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ বিবাহ দিয়াছিলেন, সমাজ তাঁহাকে একঘরে করিতে চাহিলে, গৌরাঙ্গ চৌধুরী ব্রাহ্মণেতর সকল প্রজাকে ডাকাইয়া বলিয়া দেন—"যদি ভট্টাচার্য্যমহাশয়কে কেহ এক ঘরে করিবার কথাটি পর্য্যন্ত বল, তাহা হইলে তোমাদের নাকালের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়া দিব।" সেই দিন সেই ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে সকলেই প্রসাদ পাইয়াছিল—গৌরাঙ্গ চৌধুরী সকলকে জল দিয়াছিলেন। কাহারও 'টুঁ' করিবার সাহস হয় নাই।

জমিদার রায়চৌধুরী, গৌরাঙ্গের হাতের অন্ন জল গ্রহণ করিয়া থাকেন। তখনও তাঁহার মাহিনা 'পাঁচ টাকা'—দোল, দুর্গোৎসব, ব্রাহ্মণ ভোজন, অতিথি বিদায় বৎসরে দুই তিন বার হয়। সেই জন্য দেশের লোকে ছেলেদিগকে দুষ্টামি বা বাবুগিরী অথবা জোর জবরদস্তি করিতে দেখিলে বলে—পাঁচ টাকিয়া পুরুষ এলেন আর কি !

কালিকাপুরের দুই তিন জন ধনীও 'পাঁচ টাকিয়া পুরুষ' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কেহই গৌরাঙ্গ চৌধুরীর মত ক্ষমতাশালী নহেন। এদেশে কথায় কথায়, পাঁচ টাকিয়া পুরুষের তুলনা প্রদত্ত হইয়া থাকে। অনাথের মাতার পাঁচ টাকিয়া পুরুষের গল্প এইখানে শেষ হইল। কিন্তু আমার গল্প এখন ন'টে শাকটি মুড়াইতে পারিল না। গল্প শেষ হইলে, আমি ও অনাথ মালতীকুঞ্জ দেখিতে যাইলাম। পূর্ব্বে কতবার মালতীকুঞ্জের আখড়া দেখিয়াছি, কিন্তু আজ তথায় গিয়া সকলি যেন নূতন বোধ হইল। অনাথ বলিল—ঐ মালতী লতার তলায়, ঐ মালতীর সমাজ, ইট দিয়া সুন্দর বাঁধান রহিয়াছে দেখ। অনাথের মাতার নিকট, আমার মায়ের কথা একটু একটু শুনিয়াছিলাম। মাকে মনে পড়িল, কি যেন অসীম চিন্তা লইয়া আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শুনিলাম, দশজন জমিদারের বরকন্দাজ আসিয়া আমার বৃদ্ধ পিতাকে কোদালে বাধানের কাছারীতে লইয়া গিয়াছে। আমি তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া, জমিদার রায়চৌধুরীর কাছারী অভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ



আমার পিতার অকাল মৃত্যু

"বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার,
রয়েছে সম্মুখে ছায়া পথের মতন ;
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ।
আমি এ কলঙ্ক ডালি লইয়া মাথায়,
দেখাবনা মুখ পুনঃ স্বজাতি-সমাজে ;
সঁপেছি জীবন মম এই প্রতিজ্ঞায়,
কথায় যা বলিলাম দেখাইব কাজে।
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাই আর।"

(নবীন)

গৃহ হইতে বাহির হইয়া আম বাগানে প্রবেশ করিয়াছি; সম্মুখে দেখিলাম বাহকেরা কাহার শব লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাহকেরা জমিদারের পাইক। একজন বরকন্দাজ আমাকে দেখিয়াই বলিল—'ওরে শালা গণ্শা! তোর বাবা শালাকে নে।' এই বলিয়া শবটা আমার

সম্মুখে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল—দেখিলাম আমার পিতা—এখন জীবিত রহিয়াছেন—মস্তক ফাটিয়া শোণিত ধারা বহিতেছে। পিতা আমার অজ্ঞান, আমি পিতাকে কোলে করিলাম, তখন হৃদয়ের ভাবটি যে কেমন হইয়াছিল, তাহা আর লিখিতে পারিলাম না। কে পশ্চাৎ হইতে ডাকিল 'গণেশ'! ফিরিয়া দেখি অনাথ আসিয়াছে, তুইজনে ধরাধরি করিয়া পিতাকে গৃহে লইয়া যাইলাম। মাথায় জল দিলাম—মুখে জল দিলাম—বাতাস করিতে লাগিলাম। ঘণ্টা কয়েক পরে পিতার চৈতন্য হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন—গণেশ! সেই বিপদকালে এক বিন্দু জলও আমার চক্ষু দিয়া গড়াইয়া পড়ে নাই। সমস্ত শরীর আগুনের মত জ্বলিতে ছিল। আমার চোখ তুটী দিয়া যেন আগুনের ঝল্‌কা বাহির হইতেছিল। আমি ও অনাথ সমস্ত রাত্র পিতার সেবা শুশ্রূষা করিলাম। প্রাতে পিতার সম্পূর্ণ চেতনা হইল। তিনি একবার চারিদিক দেখিয়া বলিলেন—গণেশ! আমি কোথায়? আমি বলিলাম—বাড়ীতে। পিতা আর কিছু বলিলেন না। সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পিতার ভীষণ কম্প সহ জ্বর আসিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ আরম্ভ হইল।

কালিকাপুরে একজন কবিরাজের বাড়ী ছিল—তিনিই সবেধন নীলমণি! কি করি একজন চিকিৎসকের ত আবশ্যক! সুতরাং কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী যাইলাম। কবিরাজ মহাশয়ের দেখাও পাইলাম। আমার পিতার কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন—ও ক্ষেত্রে আমি যাইতে পারিনা।—আমি অনেক কাঁদাকাটা করিলাম, পা তুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কতই না সাধ্য সাধনা করিলাম, কবিরাজ মহাশয়ের দয়ার উদ্রেক না হইয়া, ক্রমশ বিরক্তির লক্ষণ দেখা দিল। শেষে বলিলেন—গণ্শা, আমার বাড়ীর সামানা হতে বাহির হ—নতুবা খড়মপেটা করব। আমি অবাক্ হইলাম—এত পূজার বুঝি এই বরদান! আমি তত্রাচ তাঁহাকে

অনুনয় বিনয় করিতে বিরত হইলাম না। নরাকার পশুর হৃদয় বিন্দু-মাত্র কোমল হইল না! আমি ত কবিরাজ মহাশয়ের কোন অপরাধ করি নাই। পিতাও ত কখন কবিরাজ মহাশয়কে অপমান করেন নাই। তবে কেন এমন কথা বলেন! যখন কিছুতেই যাইবেন না বুঝিলাম, তখন বলিলাম—দয়া করিয়া কিছু ঔষধ দিন। রুক্ষস্বরে উত্তর দিলেন—কিছুই মিলিবে না তুই বেরো। কণ্ঠস্বর যেন বজ্রাঘাতের মত তীব্র। বুঝিলাম বিশ্ব হইতে দয়া, প্রেম, করুণা লোপ পাইয়াছে! দেশ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে—এখানে মানব নাই সকলেই পিশাচ! হৃদয় নাই—দৈত্য, দানবে পূর্ণ! আমার মাথার উপর বিপদ পড়িয়াছে, আমি এই বিপদের উপর বিপদের যাতনা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি। কবিরাজ আমার যাতনা যদি বিন্দুমাত্র বুঝিত, তাহা হইলে এ প্রকার অমানুষিক ভাষায় উত্তর দিত না। আমি বলিলাম—কবিরাজজী, ঔষধের মূল্য দিতেছি অন্ততঃ একগুলি ঔষধও দিন্। এবার উত্তরটা আরও রুক্ষভাবে হইল, বেরো শালা আমার বাড়ী হতে! নিজেরা মরূছ মর—আমাকে জড়াও কেন! আমি নাছোড়বান্দা,—বলিলাম ঔষধ না দেন অন্ততঃ একটা ব্যবস্থা বলিয়া দিন। আমার ভারি বিপদ কবিরাজ মশাই! বাবা এখন তখন হইয়া আছেন।—তোর বাবা, এখন তখন তাহাতে আমার কি? বেরোও বাপু, শীঘ্র বেরোও! আমাকে আর জড়াইওনা—যে সাপে কেটেছে ওর রোজা এদেশে নেই। কার ঘাড়ে দুটা মাথা আছে। আমি তোমার কোনই সাহায্য করিতে পারিব না। তুমি ভালয় ভালয় চলিয়া যাও। লোকে দেখিলে বিপদ বাড়িবে। আমি মনে মনে চিন্তিত হইলাম—বিনা ঔষধে পিতার মৃত্যু হইবে ভাবিয়া হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি কবিরাজ মহাশয়কে বলিলাম—যদি আপনি দয়া করিয়া ঔষধ না দেন, ব্যবস্থা না বলিয়া দেন তাহা হইলে আমি সহজে ছাড়িব না।

কবিরাজ মহাশয় একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন— ব্যাটা হারাম্‌জাদ্‌, আমার বাড়ীতে দাঁড়াইয়া আমার উপর জোর জবরদস্তি, জান না এখনি মাথা ফাটিয়ে দোব! আমি বলিলাম—তাহা আপনি পারেন, কিন্তু আমার পিতার জন্য ঔষধের আবশ্যক, যদি না দেন তাহা হইলে এই রাস্তা দিয়া যাইব আর সকল লোককে বলিব—আমার পিতার জন্য কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে ঔষধ আনিলাম, তিনি প্রাতে আমার পিতাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। আমার পিতার মৃত্যু নিশ্চয় হইবে, অপঘাতে মৃত্যু হইবে বিনা ঔষধে মরিবে তাহা আমার সহ্য হইবে না— আমি আপনাকেও জড়াইয়া দিব। বুঝিবেন জমিদার রায়চৌধুরীর মহিমা। কবিরাজ মহাশয়ের স্বর একেবারে নামিয়া গেল তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন —এস বাবু ঔষধ লইয়া যাও। আর গোলযোগ করিও না, স্ত্রী পরিবার লইয়া ঘর করি তাই জমিদারের ভয় করি বাপু মনে কিছু করিও না। আর আমি যে ঔষধ দিলাম দেখ বাপু একথাও যেন প্রকাশ না হয়। আমি ঔষধ পাইলাম—ব্যবস্থা শুনিলাম—কবিরাজ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বাড়ী আসিলাম।

পিতার অবস্থা পূর্ব্ববৎ—ঔষধ প্রয়োগ করিলাম। অনাথ বাড়ী গিয়াছে। আমাদের বাড়ীতে এক বৃদ্ধা পিসীমা ছাড়া আর কেহ নাই। পিতার নিকট বসিয়া বসিয়া কত চিন্তা-রাজ্য মধ্যে বিচরণ করিতেছি তাহার সংখ্যা নাই। মানুষ যদি কল্পনাবলে নূতন নূতন চিন্তা-রাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ না হইত—তবে মানবের বিন্দুমাত্র শান্তি থাকিত না। চিন্তা, মানবের বর্ত্তমান অবস্থা দৈন্য দুঃখ ভুলাইয়া রাখিতে পারে। অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারে। চিন্তা করিতে করিতে এক একটী বিষয় সহজ হইয়া পড়ে। নূতন উপায়, নূতন বুদ্ধির উদয় হয়। সময় বুঝিয়া বুদ্ধি খরচ করিতে পারিলে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। কবিরাজই ইহার

প্রমাণ—যে ভয়ে, সে ঔষধ দিতেছিল না, সেই ভয়টাই একটু অন্য রকমে তাহার উপর কার্য্য করিয়া ঔষধ দিতে বাধ্য করিল, ঐ স্থলে অনুনয় বিনয়, শীলতা, দয়াদাক্ষিণ্য, মায়া, মমতা, অর্থ যশঃ কিছুতেই কিছু হইল না। উৎপীড়নের আতঙ্কে, জমিদারের অত্যাচারের ভয়ে, তাহাকে অভিভূত করিয়া আত্মরক্ষার্থে পিশাচ প্রকৃতিতে পর্য্যবশিত করিয়াছিল। কিন্তু সেই জমিদারের উৎপীড়ন ভয়, সেই অত্যাচারের ভয়, একটু ভিন্নরূপে তাহাতে প্রযুক্ত হইবামাত্র, আতঙ্কের উপর আতঙ্ক পড়িয়া আমার কার্য্যোদ্ধার হইল। সংসারে এই রকমের নীতি প্রয়োগ করিতে পারিলে টিকিতে পারিব, কার্য্যোদ্ধার হইবে, নচেৎ মৃত্যু নিশ্চয়। বিষের ঔষধ বিষই নিশ্চয়! আমার মনের মধ্যে এই "কবিরাজনীতি" বেশ খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। নীতিটা কিছুই না, একটা অদৃশ্য শক্তি, সকল শক্তির মধ্যে বুঝিয়া সুঝিয়া, একটা সমশক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলেই কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে, আমার মাথায় এই নীতিটা প্রথম নীতিস্বরূপ গৃহীত হইল। পিতার রোগ শয্যায় বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করি কিন্তু ঐ রকমের শত চিন্তা আমার মনে উদয় হয়—পিতার অবস্থা, এই প্রকার চিন্তায় আমি ভুলিয়া থাকি। শোক, দুঃখ, ভয় আমার মনোমধ্যে নাই। কবিরাজের বাড়ীতে আমি যে নীতি পাইয়াছি, তাহারই সাহায্যে আমার হৃদয় মধ্যে অনেক-গুলি নীতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। আমার সমুদায় চিন্তা ঐ প্রকার নীতি আবিষ্কারে সন্নিবিষ্ট হইল। আমি তখন সাংসারিক দুঃখের হস্ত হইতে, শোক তাপের যাতনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছি, এত শীঘ্র যে আমার ভাবকেন্দ্র, এত সুগভীর ভাবে চিন্তারাজ্যের তলে প্রবেশ করিবে, তাহা বুঝিতেও পারি নাই। পিতার সেবা কলের মত করিতেছি, কোন চিন্তা নাই মন আমার অন্যদিকে রহিয়াছে। যোগীর মত স্থির নিশ্চল-ভাবে বসিয়া, সংসারের জ্বালা মালা হইতে চিত্তকে দূরে রাখিয়া, আমি

যেন ধ্যানে বসিয়াছি। কত যে গভীর ভাবে নীতি-চিন্তার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছি তাহা আর কি বলিব! মনের উপর চিন্তার প্রভাব যে অসাধারণ, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। চিন্তা যদি সুপথে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে চিন্তায় অমৃত উৎপাদন করিয়া মানবকে দেবতা করিয়া দিতে পারে। তাই সংসার মধ্যে দেখিতে পাই—ভাল লোক হঠাৎ মন্দ হইয়া পড়ে। মন্দ লোকের ঘটনাচক্রে হৃদয়স্থ চিন্তাটী উল্‌টাইয়া গিয়া—দেবতা হইয়া গিয়াছে। সেই একই চিন্তাশক্তি, ঘাতপ্রতিঘাতে নূতন সাড়া উৎপাদন করিয়া দেয়—আমি চিন্তাজগতের এই সূক্ষ্ম নীতিটী আবিষ্কারের পথে ধাবিত হইয়াছি। কবিরাজের বাড়ীতেই আমার এই চিন্তা-নীতির আদি বিকাশ হইয়াছিল। সেই চিন্তা প্রভাবে আমাকে পিতৃশোকে বিমোহিত করিতে পারে নাই। আমি ঐ চিন্তা প্রভাবেই সংসার মধ্যে ত্যাগী যোগীর মত অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছি। অনবচ্ছিন্ন মনোযোগ, চিন্তার উৎকর্ষ বিধান করে। কয়লা হীরকে পরিণত হয়—মূলতঃ এক পদার্থ হইয়াও পূর্ণভাবে পৃথক দেখায়। চিন্তার মত চিন্তা করিতে পারিলে সিদ্ধি অনিবার্য্য, প্রগাঢ় চিন্তাই শ্রেষ্ঠ সাধনা! উহাই ধ্যান! উহারই নামান্তর যোগ!

দুইদিনের মধ্যেই আমি সংসার মধ্যে উদাসীন হইয়াছি—চিন্তাতেই আমার হৃদয় নিমগ্ন হইয়াছে—সংসারের অশান্তি আমার নিকট হইতে দূরে অতিদূরে সরিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমার হৃদয়মধ্যে পূর্ণ শান্তির উদয় হইয়াছে—পিতার মৃতবৎ দেহ, সম্মুখে থাকিয়াও আমার মনে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। আজিকার হিসাবে আমি নিতান্ত গণ্ডমূর্খ। গ্রাম্য পাঠশালায় আমার শিক্ষার শেষ হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমি যে, আমার অবস্থা ও স্বদেশ প্রিয় জন্মভূমির কিঞ্চিৎ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা ঐ গ্রাম্য পাঠশালার বিদ্যার বলে

নহে! চিন্তার অসীম শক্তি প্রভাবেই আমি উন্নত হইয়াছি। বিদ্যাটী বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত নহে—কোন গুরুর নিকট গুরুদক্ষিণা দিয়া লাভ হয় নাই—ঘটনাচক্রে আমি চিন্তাশীল হইয়াছি—চিন্তাই আমাকে অমৃত পানে অমর করিয়াছে। চিন্তার মত চিন্তা করিতে পারিলে মূর্খ পণ্ডিত হয়,পণ্ডিত মূর্খ হইয়া যায়। বিদ্যা, কেবল পুস্তকগত নহে—চিন্তাদ্বারা পরাবিদ্যা লাভ করা যায়। মনকে চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, সংসার-মধ্যে সুখ দুঃখের অতীত হইতে পারিলে—শ্রেষ্ঠ আসনে বসিতে পারা যায়। আমি মুক্তির জন্য চিন্তা করি না—সংসারে বদ্ধ থাকিয়া চিন্তার প্রসাদে আমি মুক্তবৎ হইতে চাই! অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থ, দুষ্টের দমনার্থ, অশান্তির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার্থ, অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থ, আমার হৃদয় গঠিত হইতেছে। এখন আমার এ সাধনার সমাপ্তি হয় নাই। যদি পার এস! স্বদেশের জন্য, দুঃখ দারিদ্র্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য, ভীষণ-তার মধ্যে কোমলতা বিকাশ করিয়া দিবার জন্য, নিজ স্বার্থ বলি দিয়া পরের জন্য চিন্তাদ্বারা অমৃত আহরণ কর। দেশের উদ্ধার হইবে—সুপথ ও সুনীতি দেখিতে পাইবে। পরের জন্য চিন্তা কর—তোমার জন্মভূমির জন্য চিন্তা কর—দেশের দুঃখ দৈন্যের পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য চিন্তা কর। ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনের মধ্যে, প্রাণময় অমৃতময় চিন্তাকে আহ্বান কর। একনিষ্ঠ সাধনাবলে, চিন্তাই তোমাকে বিদ্বান বুদ্ধিমান করিয়া দিবে। আমার পিতার দুর্দ্দশা ও অপমান চিন্তাই, আমাকে দেশের দুর্দ্দশা ও অপমাননা চিন্তা করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছে।

দুই দিনের পর অদ্য প্রাতে পিতার জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। পিতা অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন। সর্ব্বাঙ্গে এখন ভীষণ বেদনা—সমুদায় পিঠের চামড়ায় কালশিরা পড়িয়াছে। পাঁচ সাত স্থানে ঘা হইয়াছে। পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা নাই। কল্য হইতে প্রস্রাব হয় নাই। পিতা ধীরে

ধীরে বলিলেন—গণেশ! আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দাও—মাথাটা দপ্ দপ্ করিতেছে—মাথার মধ্যে বড়ই যাতনা হইতেছে। আমি ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলাম। মাথায় দুই তিনটী আঘাতের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইল। পিতার শয্যাপরি বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছি, আর পিতার মলিন মুখ দেখিয়া বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছে। এক একবার ভগবানপ্রসাদ রায়চৌধুরীর অমানুষিক বর্ব্বরতার কথা মনে উদয় হইতেছে—নরপিশাচ দস্যু দাওয়ানজী ডাকাতের উপযুক্ত পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতার কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছে। ভগবানপ্রসাদ রায়চৌধুরীর মতন নরপিশাচ এদেশে দুর্ল্লভ হইলেও সমগ্র বঙ্গে আদৌ অভাব লক্ষিত হয় নাই। ছোট লোকের হস্তে প্রকৃতিপুঞ্জের শাসনভার সংস্থাপিত হইলে, দুরাত্মাগণ নিজের প্রাধান্য ও ক্ষমতা প্রকাশেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। কঠোর শাসনপদ্ধতি বদ্ধমূল করিয়া, দুনিয়াখানা সরারমত জ্ঞান করিয়া, যতপ্রকার অনিষ্ট সাধন দ্বারা অর্থ শোষণ করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করে। নির্ব্বোধগুলা ভাবিয়া থাকে, কঠোর শাসন দ্বারা প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব শোষণ করাই, বুঝি প্রকৃত প্রজাপালন! পাপিষ্ঠ ভগবানপ্রসাদ রায়চৌধুরী, পাপের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, পাপ অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, ক্রূর সর্পের ন্যায় প্রজাপুঞ্জকে দংশন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিষের জ্বালায় নরনারী নিয়ত পাপিষ্ঠকে অভিসম্পাত দিতেছে—এমন মুহূর্ত্ত নাই, যে সময় কেহ না কেহ রায়চৌধুরী বংশকে 'নির্ব্বংশ হও' না বলিতেছে। কেহ ভ্রমেও দুষ্ট ভগবানপ্রসাদকে আশীর্ব্বাদ করে না। ঈশ্বর যদি থাকেন—যদি "দণ্ড মুণ্ডের" একজন অদৃশ্য সর্ব্বময় কর্ত্তা বিদ্যমান থাকেন—তাহা হইলে এই দুষ্টের শাস্তি তিনিই দিবেন—দুষ্টের দমন মধুসূদন করিবেন—যিনি রাবণ বধ করিয়াছেন, কংস ধ্বংস করিয়াছেন—সেই কৃপাসিন্ধু হরিই, এই দুষ্টকে নিপাত করিবেন।

এই প্রকার চিন্তা করিতেছি—পিতা বলিলেন—গণেশ! তোমাকে এক দিন বলিয়াছিলাম একটী গূঢ় কথা বলিব—আজ সেই কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আমার একটু নিকটে সরিয়া এস। আমি আমার মনের কথা দু চারিটী বলিব।

গণেশ! তুমি যখন ছ মাসের শিশু ছিলে, তখন ভগবানপ্রসাদের পিতা, আমাদের বাড়ী ডাকাতি করে। সে রাত্র বড়ই ভীষণ হইয়াছিল, গভীর অন্ধকার তাহার উপর আকাশে মেঘাড়ম্বর হইয়াছিল। ডাকাতি করিয়া আমাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। তোমার মা তোমাকে কোলে করিয়া ঐ কাঁচামিঠা আমতলায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি তাঁহার একটু দূরেই দাড়াইয়া ছিলাম। বড় ঘরখানি তখন পুড়িয়া ছাই হইয়াছে—ছোট ঘরখানি পুড়িতেছে। আমরা নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বস্ব দগ্ধ হইতেছে দাড়াইয়া দেখিতেছি। আতঙ্কে একটি কথাও বলিতে সাহস হইতেছে না। হঠাৎ কে, আমার মাথায় লাঠির আঘাত করিল, আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, আমি মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। ঠিক্ সেই সময় তোমার মা চিৎকার করিয়া উঠিলেন—আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম—তোমার মা চিৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে—আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর—তাহার পরই নিস্তব্ধ, আর কোন শব্দ শুনিতে পাই নাই। আমি একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম—কে আমার পায়ে এক লাঠি মারিল, আমি পড়িয়া গেলাম।

ঘরগুলি পুড়িয়া গিয়াছে। পাড়ার ঘরগুলি পুড়িয়া গিয়াছে—ডাকাতেরা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। পাড়ার লোকে জটলা করিয়া বেড়াইতেছে—যেন আমার ঘুম ভাঙ্গিল, আমি কলাতলায় পড়িয়া "রহিয়াছি বুঝিলাম। উঠিয়া বসিলাম—তখনও মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরি-

তেছে। ঘুর্ণি উঠিলে যেমন পায়ের তলার মাটি ঘানীগাছের মত ঘোরে বলিয়া বোধ হয়, তখন আমারও তদ্রূপ হইতে ছিল। তোমার বড় পিসী আমার মাথায় জল দিলেন। আমি এক ঘটী জল খাইয়া বলিলাম—গণেশের মা কোথায় ?—দেখি তোমার পিসীর কোলে তুমি রহিয়াছ। দিদি কাঁদিয়া উঠিলেন—বুঝিলাম তোমার মাকে নরপিশাচ দাওয়ান ডাকাত চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। গণেশ বুঝেছ! বুকে করিয়া তোমাকে মানুষ করিয়াছি—একদিন তুমি তোমার মাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবে বলিয়া। আমি সাধ্যমত সতী সাধ্বীর অনুসন্ধান করিয়াছি। শেষে একটু সন্ধান পাই—মুরশিদাবাদে একজন ব্রাহ্মণের গৃহে আছেন। তাহার পরই ভগবানপ্রসাদের অত্যাচারে মরিতে বসিয়াছি। বাবা গণেশ! যদি তুমি মানুষ হও—যদি তোমার শিরায় মানবের রক্ত প্রবাহিত থাকে—তাহা হইলে তুমি, তোমার মাতার অনুসন্ধান করিবে। তোমার স্নেহময়ী মাতার অনুসন্ধানের জন্য বেশী সময় পাইবে না—এক মাস সময় পাইবে, ঐ সময় মধ্যেই তোমাকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমার যেদিন শ্রাদ্ধ হইবে, সেই দিনই তাহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাপ্ত করিও। আর একটী কথা বলিব, যদি তুমি আমার পুত্র হও তাহা হইলে ইহা পালন করিবে—যে কোন উপায়ে হউক আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হইবে—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম, জমিদারের ভীষণ অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেই হইবে—তাহাতে এই রায়চৌধুরী বংশকে নির্ব্বংশ করিয়াই হউক, বা যে কোন প্রকারেই হউক, রায়চৌধুরী বংশের শেষ করাই আমার ইচ্ছা; বংশে যেন বাতি দিতে কেহ না থাকে। এই বংশে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা যেন জীবনে কখন শান্তি সুখ অনুভব করিতে না পারে, চিন্তাবিষে বিবিধ দুশ্চিন্তায় হৃদয় যেন ধীরে ধীরে পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হয়। বাবা গণেশ!

পারিবে কি ? যদি তুমি না পার প্রতিজ্ঞা কর, তোমার উপযুক্ত পুত্রকে আমার মত মৃত্যুকালে তুমি তাহাকেও এই প্রতিহিংসা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া মরিবে ! আমার হাতখানি পিতা ধরিয়াছিলেন, আমি বলিলাম আপনাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, ভগবানপ্রসাদের বংশে বাতি দিতে কাহাকেও রাখিব না—ভগবানপ্রসাদের বংশ, দাওয়ান শালার বংশ নির্ব্বংশ করিব। মাতার অনুসন্ধান করিব—আপনার ও মাতার সঙ্গে ভগবানপ্রসাদের পিণ্ডের ব্যবস্থা করিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ



শব-সাধনা

"এই শ্মশানের মাঝে শক্তির সাধনা
তব আরাধনা নহে, হে বিশ্বপালক !"
(রবীন্দ্র)

অদ্য অপরাহ্নে পিতার মৃত্যু হইয়াছে। কোদ্‌লীবাদার কূলে শ্মশান। অনাথ ও আমি সেই পবিত্র শ্মশানে পিতার উজ্জ্বল চিতার পার্শ্বে বসিয়া আছি। সূচীভেদ্য অন্ধকার, আকাশে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ ঝিক্ মিক্ করিতেছে। মাঝে মাঝে দম্‌কা বাতাস বহিতেছে। অনাথ বলিল—গণেশ ! আজ আমাদের সাধনার দিন, অগ্নি আজ তোমার পিতার শবাধার, তাঁহার দেহ এই পবিত্র শ্মশানে ভস্মীভূত হইতেছে। আমরা আজ যজ্ঞকুণ্ডের নিকট মহাশ্মশানে মহাশক্তির সাধনায় বসিয়াছি। কেমন গণেশ ! সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে ত ?—তোমার হৃদয়ে সাহস আছে ত ? দেখিও, কাপুরুষের ন্যায় পিতার আদেশ ভুলিও না। সংসারকে উল্টাইয়া দিতেই হইবে, অত্যাচারী দাওয়ানের বংশ ধ্বংস করিতেই হইবে। নর-নারী-ঘাতক, উৎপীড়ক ভগবানপ্রসাদের বংশে কাহাকেও বাতি দিতে রাখিব না ! সহস্র সহস্র নর-নারীর প্রতি যে প্রকার অত্যাচার আরম্ভ

করিয়াছে ইহা কি ভগবান্ সহ্য করিবেন ? দুষ্ট মনে করিয়াছে, দুর্ব্বল দরিদ্র প্রজারা জমিদার ভগবানপ্রসাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না ! অত্যাচারের ফল ফলিবেই ফলিবে, কালসর্প হইলেও সহস্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা তাহার অস্থি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া ফেলিতে পারে। সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র বল, মহান্ বলকে পর্য্যুদস্ত করিবেই করিবে ! যে দিন পাপ পূর্ণ হইবে, সেই দিন লোহার বাসরে লক্ষান্দ্রকে সর্পে দংশন করিবেই করিবে। অর্থ বল, লোক বল—কিছুতেই কিছু হইবে না। মরণের দিনে ধ্বংসের দিনে কিছুতেই মৃত্যুর নিকট অব্যাহতির উপায় নাই।

ভাই গণেশ ! এই শ্মশানে যে সাধনা আরম্ভ হইল, মনে রাখিও ইহা বিশ্বেশ্বরের উপাসনা নহে—এ মহাশক্তির জন্য সাধনা—দুষ্ট দাওয়ানের বংশধরগণের বিনাশার্থ উৎকট সাধনা ! এ মহান্ শব সাধনা ! মাভৈঃ মাভৈঃ গণেশ, ভয় নাই এই তোমার উত্তরসাধক অনাথবন্ধু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ! দেশের অত্যাচার দূর করিতে, নরপিশাচ জমিদারের প্রজানিগ্রহ নিবারণের জন্য এই শবসাধনা ! দাওয়ানজীর বংশ ধ্বংসের জন্য এই সাধনা ! দাও স্বার্থের আহুতি তোমার পিতার চিতাগ্নিতে ! দেশের অত্যাচার দূর করিবার জন্য দাও আহুতি তোমার পিতার চিতাগ্নিতে ! তোমার মাতৃ অপহরণকারীর বংশ ধ্বংসের জন্য দাও আহুতি তোমার পিতার চিতাগ্নিতে ! শত সহস্র নরনারীর উৎপীড়নকারীর উৎপীড়নার্থে দাও আহুতি তোমার পিতার চিতাগ্নিতে !—যে দুষ্ট দেশের মধ্যে অশান্তির অনল প্রজ্জ্বালিত করিয়াছে তাঁহার বংশে চির দুর্জ্জয় অশান্তি বিরাজের জন্য দাও আহুতি তোমার পিতার চিতাগ্নিতে !

পিতার চিতাপার্শ্বে বসিয়া অনাথের কথাগুলি শুনিতেছি, আর কত কি আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছি। ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল—রাজা, জমিদার, প্রজা কি পৃথক্, সকলেরই পরিণাম আমার পিতার ন্যায় মৃত্যু ও

চিতায় দগ্ধ হওয়া। যাহারা উৎপীড়ক, যাহারা অর্থের জন্য পরকে উৎপীড়ন করে, বিশ্বপ্রেমকে যাহারা স্বার্থের খড়্গে বলি দিতে চায়, তাহারা কি এই শেষ পরিণামের বিষয় একমুহূর্ত্ত মাত্রও চিন্তা করে না? তাহারা কি কখন কাহাকেও মরিতে দেখে নাই? তাহারা কি সংসারে অমর বলিয়া মনে করে! ভগবানপ্রসাদ! একবার দেখ, তোমার অত্যাচারে অকালে, আমার পিতার জীবনান্ত হইয়াছে, তুমি এই বৃদ্ধের জীবন-নাশের সমগ্র পাপ নিজের মাথায় লইয়াছ। তোমার পাপের বোঝা কত ভারি হইয়াছে একবার বুঝিতে চেষ্টা কর! আর মনে রাখিও আজ হউক, কাল হউক বা দুদিন পরে হউক, তোমার প্রাণশূন্যদেহ এই প্রকার শ্মশানে দগ্ধ হইবে! তুমি ভারতের সকল তীর্থ পর্য্যটন কর, সকল পূজা পার্ব্বণ কর, শত দেবালয় ও দেবতা প্রতিষ্ঠা কর, তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! এই পাপেই তোমার হৃদয় অশান্তিতে দগ্ধ হইবে, তোমার পিতার পাপার্জ্জিত কাঞ্চনরাশি, তোমার বংশ ধ্বংসের পথ সুপ্রসস্থ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবন ও বংশের উপর সহস্র সহস্র নরনারীর অভিসম্পাতের বোঝা, ভারি করিয়া তুলিতেছ। তুমি কি মরিবে না? তবে কেন বর্ব্বরের ন্যায় পৈশাচিক প্রবৃত্তিতে ডুবিয়াছ? জান, অলক্ষ্যে মাথার উপর ন্যায়দণ্ড হস্তে এক দিব্য পুরুষ নিয়ত বিদ্যমান আছেন! তোমার অত্যাচার ও পাপরাশির তিনি সংখ্যা করিতেছেন!

যত দিন যাইতেছে, ততই আমার ন্যায় একটি একটি শত্রু বাড়িয়া শত শত শত্রুতে পরিণত হইতেছে। তুমি হাসিয়া বলিবে— এ ক্ষুদ্র শত্রু তোমার নিঃশ্বাসে উড়িয়া যাইবে, আমরাই তোমার রোষাগ্নিতে পুড়িয়া মরিব। কিন্তু মনে রাখিও নন্দবংশ ধ্বংসের ইতিহাস! কংস, জরাসন্ধের কথা বলিতে চাই না, একজনের মন্ত্রণায় নন্দবংস ধ্বংস হইয়াছিল।

চাণক্যের মত এমন একজন জন্মিবে, যাহার মন্ত্রণায় তোমার এত সাধের ধনৈশ্বৈর্য্যপূর্ণ বংশ কোথায় উড়িয়া যাইবে? তোমার মত কত শত জমিদারের অত্যাচারে দেশ শ্মশানে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাইতেছ?

"—————যথায় তথায়
হাহাকার ধ্বনি রাজ্যে উঠিছে কেবল।
নাচে অত্যাচার, করে উলঙ্গ কৃপাণ;
সুন্দর বাঙ্গালা রাজ্য হয়েছে শ্মশান।"

ভগবানপ্রসাদ! বেশ! মনে রাখিও আমি তোমার শত্রু! তোমার উপযুক্ত, তোমার সমকক্ষ শত্রু কি না দেখিও! বুঝিতে দিব না, জানিতে দিব না—আমি তোমার শত্রু কি না; কিন্তু বুঝিবে—বাঙ্গালার নবাব সিরাজের শেষ পরিণাম, মহম্মদীবেগ সিরাজের উপযুক্ত শত্রু নহে, পায়ের তলার ধূলিকণাও নহে, কিন্তু ভগবানপ্রসাদ! সিরাজ সেই নগণ্য মহম্মদী বেগের নিকট পা ধরিয়া জীবনভিক্ষা চাহিয়া ছিল—মহম্মদী বেগের মত লোকও সিরাজের সে প্রার্থনা শোনে নাই। তোমার দশা ঐ প্রকার হইবে, মনে রাখিও।

'হরি হরি বল হরি বোল' শব্দে চমকিয়া উঠিলাম, আবার কে শশ্মানে আসিতেছে! কে মরিল! আমার পিতার মত মৃত্যু কাহার হয় নাই ত! আবার—হরি হরি বল হরি বোল! আমাদের চিতার অনতিদূরে তাহারা বস্ত্রাবৃত শব নামাইল। দেখিলাম কালিকাপুর হইতে আসিয়াছে, একটী বালকও সঙ্গে আসিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন্ রোগে মরিয়াছে? রামগোপালনন্দী বলিলেন—দেশে এখন যে রোগ প্রবল? আমি বলিলাম দেশে ত এখন কোন রোগ

নাই। রামগোপাল বলিলেন—গণেশ! যে রোগে তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সেই রোগেই আমার কাকার মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের গ্রামের ভজহরিও এই রোগে মরিয়াছে, তাহারা পশ্চাতে আসিতেছে—ঠিক এই সময়ে শব্দ উঠিল—হরি হরি বল হরিবোল! আমরাও গাহিলাম—হরি হরি বল হরিবোল! এ অন্তিমের সঙ্গীত, এ সঙ্গীত পরম উদার ও মহৎ এবং পবিত্র। ভগবানপ্রসাদ—তোমার শবের বাহকগণও এই অন্তিম সঙ্গীত গাহিয়া, তোমার পাপময় দেহ এই রকম শ্মশানে নামাইয়া, মুখে অগ্নি দিয়া দাহ করিবে, এ কথা কি তোমার মনে একবারও উদয় হইতেছে না!

অনাথ, রামগোপাল নন্দীকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কাকার মৃত্যুর ব্যাপারটা কি প্রকার? উত্তর তীব্র ভাবেই হইল—প্রকার অপ্রকার নাই একই প্রকার! আমাদের আমবাগানের একটা শুষ্ক আমগাছ কাষ্ঠের জন্য কাটাইতে গিয়াছিলেন। খানিকটা কাটা হইয়াছে, এমন সময় জমিদারের একজন পাইক আসিয়া বলিল—জমিদারের হুকুম, গাছ কাটিওনা; কাকা বলিলেন আমার বাগানের গাছ, পিতার রোপিত বৃক্ষ, কাটিবনা কেন? উত্তর হইল—তাহা জানিনা গাছ কাটিওনা। কাকা সামান্য পাইকের কথায় কার্য্যে বিরত হইলেন না। পাইক চলিয়া গেল, গাছ কাটা হইল—কাকা বাড়ী আসিলেন। ক্ষণকাল পরে দশজন লাঠিয়াল, আমাদের বাড়ীর দরজায় আসিয়া কাকাকে ডাকিল, কাকা বাটীর বাহির হইবামাত্র একজন বরকন্দাজ কাকার কাণ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

যাহারা এই কার্য্যে বাধা দিতে গিয়াছিল তাহারা প্রহারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিল। কাকাকে মারিতে মারিতে লইয়া গেল। গ্রামের লোকে কেহ গৃহ হইতে বাহির হইল না। সন্ধ্যার পর, কাকার মৃতদেহ আমাদের বাড়ীর দরজায় রাখিয়া পঁচিশ জন লাঠিয়াল চলিয়া গেল। এই

প্রকার! ইহা ছাড়া আর অন্য কোন প্রকার নাই! ভগবান শালার মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে—এমন সৎলোককেও সে হুকুম দিয়া মারিয়াছে। এ দেশে আর বাস করা চলে না! নন্দীর চিতা সজ্জিত হইল, নন্দীর মৃতদেহের বদনমণ্ডল রক্তরঞ্জিত, নাসিকা হইতে তখনও টস্ টস্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে, মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে!—হরি হরি বল একবার হরি বোল।

পরক্ষণেই তৃতীয় শব শ্মশানে আসিল! বর্দ্ধিত হারে খাজনা না দিতে পারায়, প্রজার মৃতদেহ শ্মশানে আসিয়াছে! আমি ভাবিলাম প্রজা মারিয়া জমিদারী শাসন—এ বর্ব্বর প্রথা কি আমাদের জন্মভূমির চণ্ডাল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, না কোন স্বপ্নরাজ্যের পিশাচকর্ত্তৃক পৈশাচিক অনুষ্ঠান! ভগবান! প্রজাশাসনের ভার এই রকমের বাঙ্গালীর হাতে দিওনা প্রভু! পিশাচের তাণ্ডব নৃত্যে বঙ্গদেশ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! ভগবান তুমি দুর্ব্বলের বল! তুমিই ইহার বিচার করিও!

তিনটী চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, শ্মশান আলোকিত! আমরা শব-সাধনায় নিযুক্ত! আমরা সকলেই মহাশ্মশানের চিতাগ্নি সন্নিকটে প্রতিজ্ঞা করিলাম—প্রতিহিংসা সাধন করিব—যে কোন রূপেই হউক, মা আত্মা-শক্তি আমাদের সহায় হউন! আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণও এই প্রতিহিংসা পালন করিবে। মিলিতকণ্ঠে শ্মশানভূমি কম্পিত করিয়া শব্দ উঠিল—হরি হরি বল হরি বোল!

"ভগবানপ্রসাদ নির্ব্বংশ হউক।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ



গৌরাঙ্গ ভেট

রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর,
জেতার উপরে জেতা, জিতের সহায়,
আছেন উপরে বৎস, অতি ভয়ঙ্কর !—
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্ত্তিমান ন্যায়।
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্র মণ্ডলে
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে ;
সমভাবে, সর্ব্বদেশে, শ্বেতে ও শ্যামলে,
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল ;
সম্মুখে ভীষণ, বৎস, গণনার স্থল।"

(নবীন)

পিতার মৃত্যুর দুই দিন পরে, মহানন্দাতীরস্থ রহমৎগঞ্জে চলিলাম। উদ্দেশ্য গৌরাঙ্গ চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ। যে নীতিমন্ত্র কালিকাপুরের কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি, সেই নীতির পরীক্ষার্থ চলিয়াছি— এক নীতি হইতে বহু নীতির বিকাশ সম্ভব করিবার জন্য গৌরাঙ্গ নিকেতনে চলিয়াছি। মহাশ্মশানের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া মহামায়ার

পূজার্থে চলিয়াছি। পল্লীপথ অতিক্রম করিয়া, খাল বিল পার হইয়া, পল্লীর পর পল্লী অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। শক্তিবীজ—প্রতিহিংসা-মন্ত্র, জপ করিতে করিতে চলিয়াছি। দেখিলাম অপূর্ব্ব দৃশ্য, মালিগঞ্জের মত সকল পল্লীই শ্রীভ্রষ্ট! সকলেই সশঙ্কিত! দেখিলাম পশ্চিমা পালোয়ানের সুদীর্ঘ লাঠী! দেখিলাম প্রজাপুঞ্জের ভীতিবিহ্বল মলিন মুখ! বঙ্গের শান্তি সুষমামণ্ডিত পল্লীগুলি শ্মশানে পরিণত! শুনিলাম কেবল হাহাকার! দেখিলাম শ্রীহীন প্রজার কাতর শীর্ণ দেহ! নরকের পর নরক দেখিতে দেখিতে, বেলা দেড় প্রহরের সময় রহমৎগঞ্জের সীমায় প্রবেশ করিলাম। শীর্ণ খাল দিয়া ধীরে ধীরে জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দেখা যায় রহমৎগঞ্জের জমিদারী কাছারী।

গৌরাঙ্গ চৌধুরী, একখানি জলচৌকীর উপর বসিয়া স্নানার্থে নিজ হস্তে তৈল মর্দ্দন করিতেছেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—কিরে গণ্‌শা, কাকা কবে মরিয়াছে রে?—শব্দটী যেন স্নেহমণ্ডিত। আমি বলিলাম—আজ তিন দিন! কি ব্যায়রাম হইয়াছিল, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। পিতার মৃত্যু-কালেও আমার চক্ষে এক বিন্দু জল পড়ে নাই। কি জানি, আজ কেন আপনা হইতে চক্ষু প্লাবিত হইল। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—কোন ব্যায়রাম হয় নাই।—তবে কিসে মৃত্যু হল রে? জলস্রোতে নেত্র-দ্বয় অন্ধ হইয়া গেল। আমার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়াছে—আমি কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গৌরাঙ্গ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—হুঁ বুঝিয়াছি—ঐ কম্বলে গিয়া বোস। এই বলিয়া তিনি স্নানার্থে চলিয়া গেলেন।

রহমৎগঞ্জের কাছারির খুব নাম ডাক শুনিয়াছি—দেখিয়া কিন্তু এমন কিছুই বোধ হইল না। দু পাঁচজন পাইক ও বরকন্দাজ আছে,

এবং একজন মোহরের দেখিলাম—দপ্তর বাঁধিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল। বরকন্দাজ প্রভৃতি রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত। কম্বলে একাকী বসিয়া ভাবিতেছি—দূর হইতে যাহা শুনা যায়, তাহা ক্রমশঃ সুবিস্তারিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, ক্ষুদ্র বড় হইয়াই যায়। সৌন্দর্য্য, দূর হইতেই দেখা ভাল, নিকটে গিয়া উপভোগ চেষ্টা করা ভাল নয়। লোকের মুখে মুখে কথা চলিতে চলিতে, কথার বহর বেজায় বড় হইয়া উঠে। গোড়ায় কিন্তু তাহার হয়ত সন্ধানই মিলিবে না!

আমরা যাহা কল্পনা করি তাহার ভিত্তি বড় সুদৃঢ় নয়! কল্পনাটা, বেজায় আফিম্ খোরের খেয়াল দেখার মত! কল্পনার আশ্রয়ে চিন্তা যখন ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার মধ্যে একটা নিয়মানুবর্ত্তিতা, খানিকটা সত্যবৎ জ্ঞান আসিয়া দাঁড়ায়; কিন্তু আগাগোড়া সে গুলো ফাঁকা। প্রকৃতের ছায়া, সত্যের মরীচিকা—আশার আলেয়া দেখা দেয়! কল্পনা, মূলক চিন্তাতরঙ্গে, আশার সুন্দর সোনার নৌকা ভাসিয়া উঠে—উহা যে মায়ানৌকা, সম্পূর্ণ ঐন্দ্রজালিক, তাহা আশার মোহে বুঝা যায় না। সময় অতীত না হইলে মায়ার প্রবঞ্চনা প্রায়ই ধরা পড়ে না। শূন্যের উপর শূন্য দিয়া ইমারত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাসের চেষ্টা একেবারে সত্য বলিয়াই মনে হয়। কিছুতেই বুঝা যায় না যে, এ সব কল্পনাগঠিত, মায়ার খেলা প্রকৃত নহে। অনেকেই আমার মত চিন্তার ঢেউ খাইতে খাইতে, মায়া-দ্বীপের বেলাভূমে আছাড় খাইয়া পড়ে। এ যে স্বপ্ন দেখা! এ যে সত্য নয়! তাহা বুঝে কে? তখন কর্ম্মময় জীবনের সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, সম্মুখে সুদীর্ঘ কর্ম্ম পথ—বসন্তের কাশ্মীরোপত্যকা সম্মুখে দেখি! একবারও ভাবি না—ওটা মরীচিকা মাত্র—পিপাসার শান্তি হইবে না, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া, সাহারা মরু মধ্যে ভুলাইয়া লইয়া যাইবে। তখন ভ্রম ভাঙ্গিবে, যখন আর উপায় থাকিবে না।

রমহৎগঞ্জে আসিবার পূর্ব্বে, গত রাত্রে আমার নিদ্রা হয় নাই—ভাবিয়া ভাবিয়া নিজের মীমাংসার উপর প্রশ্ন করিয়া, মনে মনে কত শত কথার মারপ্যাচ্ করিয়া ঠিক করিয়াছিলাম, রহমৎগঞ্জে গৌরাঙ্গ চৌধুরীর নিকট যাইতেই হইবে। তখন আমার মনে হইয়াছিল, যে রকম বাঁধা পর্দ্দায় চিন্তা করিয়াছি, এ চিন্তা-ধ্যানের পরিণাম হাতে হাতে ফলিবে—নূতন কর্ম্মীর চিন্তাপ্রসূত বিকট কল্পনাটা বোধ হয় তালে ঠিক থাকিতে পারে না। বেজায় উচ্চাঙ্গের রাগ রাগিনীতে গান বাঁধিলে গান গাওয়া বড় কঠিন হইয়া পড়ে, তদুপরি সঙ্গতের সঙ্গে সঙ্গীত করিতে গিয়া নাকালের একশেষ হইতে হয়। আমি কম্বল খানির উপর বসিয়া ভাবিতেছি—আমার এখানে আসা বড় ভুল হইয়াছে! কবিরাজের বাড়ীর একটা নীতি লইয়া দুই দিনেই যে আমি একটা চিন্তাবীর হইয়া পড়িয়াছি! ঐ একটা নীতি হইতেই যে শত নীতি এই দুই দিনের মধ্যে আমার মাথায় গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহা বিশ্বাস করাই ভুল হইয়াছে! কি করিব! তখন ত ঠিক ঐ নীতি বলেই দিব্য দেখিতে পাইয়াছিলাম, যে এই ইহার পর এই হইবে—তাহার পর ঐ হইবে–উহার পর সেই হইবে—যেন বায়স্কোপের ছবির মত হুবহু সব দেখিয়াছিলাম! সে রকম হুবহু দেখা, কখন ভুল চিন্তা হইতেই পারে না!—তবে এখন সন্দেহ হইতেছে, সে সব চিন্তা বা কল্পনামূলক অদৃশ্য দর্শন ব্যাপারটা, তখন আমি ঠিকই দেখিয়াছিলাম। তবে নীতির ছিদ্র দিয়া দেখিয়াছি, কি ভবিষ্যৎ সুখের উৎকট কল্পনা বলেই দেখিয়াছি তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

নীতির সোপান দিয়া ধীরে ধীরে উঠা নানা করিয়া, সেই কল্পনাটাকে পরিচালিত করিয়াছিলাম? না—ভবিষ্যৎ প্রতিহিংসা সাধনের জন্য, ভবিষ্যৎ আশায় মোহিত হইয়া, একটা খেয়াল দেখার মত দেখিয়াছিলাম?

যদি বুঝি, আজিকার গৌরাঙ্গ ভেট নিষ্ফল হইয়া যায়! তাহা হইলে বুঝিব, অনৈতীক ভাবে একটা খেয়ালের স্বপ্ন দেখা হইয়াছে—সেইটাকে কুটীলনীতির প্রদর্শিত নীতি-পথ বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। যদি সফল হই, তাহা হইলে বুঝিব আমার চিন্তা সাধনামুখীন পথ ধরিয়াছে, এখন আমি পরীক্ষাস্থলে দাঁড়াইয়াছি। চিন্তা দ্বারা নীতি আবিষ্কার হইলে সেটাকে ধীরে ধীরে অগ্নি-পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। এই রকমে গোটা কয়েক নীতিসূত্র আবিষ্কার ও পরীক্ষিত হইলে, আর আমাকে কে পায়! পাকা খেলোয়াড় হইয়া পড়িব! তবে কবিরাজের বাড়ীতে হঠাৎ যে নীতি আবিষ্কার হইয়া পড়িয়াছে—তাহাতেই আমার মাথা খোলসা হইয়া গিয়াছে—আমি যেন বেশ দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এই নীতি চালের পর, এই নীতির চাল চালিলে—ঐ কাজটা ফতে হইবেই হইবে। এমন খোলসা ভাবে দেখিতে, বুঝিতে, ভাবিতে পাইয়াও যদি সকল নীতিই পণ্ড হয়! তাহা হইলে সত্য বলিয়া দুনিয়ায় আর কিছুই থাকিবে না বুঝিতে হইবে। নীতিটা, একটা পাকা দাবা খেলার চাল—বল, বড়ে প্রভৃতির একটা ব্যক্তিগত শক্তি ও গতির নিয়ম আছে; সেই শক্তি, গতি লইয়াই লড়াই করিতে হয়—ওটা যেমন একটা উচ্চাঙ্গের অঙ্ক-শাস্ত্র—নীতি টা উহার অপেক্ষা ছোট কি বড়, ঠিক এখন বুঝি নাই, কিন্তু এটাও একটা লীলাবতীর উপরের অঙ্ক। শুভঙ্করের মত ইহারও কতক গুলো বাঁধা আর্য্যা হইতে পারে। সবে মাত্র একটা আর্য্যার দৈব প্রাপ্তি বলেই, খেলা আরম্ভ করিয়াছি—না খেলিলে চাল শিক্ষা হইবে না বলিয়াই, খেলা আরম্ভ করিয়াছি। ওস্তাদ্ বুঝে চাল শিখ্‌রো বলে গৌরাঙ্গ ভেটে আসিয়াছি। দেখিতেছি চৌষট্টি ঘরের সন্ধান মনে মনে নিয়ত রাখিতে হইবে, উভয়পক্ষের চাল গুলি মনে রাখিতে হইবে,—সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতির 'গইবী'-চালই অধিক। এই নীতিটার

প্রভাব, 'গৈবী' চালের জন্যই খ্যাতিলাভ করিয়াছে। মানব প্রকৃতি ও ঘটনা-বৈচিত্রের সমাবেশ দ্বারাই, এই নীতির 'গৈবী' চাল পরিচালিত করিতে হইবে।

গৌরাঙ্গ চৌধুরীর সহিত প্রথম কি কথা আরম্ভ করিব, তাহার জন্যই ভাবনা আরম্ভ হইয়াছে, গৌরাঙ্গের প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই, কৌশলে আমার প্রশ্ন ও মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইবে। কথা বুঝিয়া, শুনিয়া তবে উপস্থিত বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। গৌরাঙ্গ পাকালোক, খুব সাবধানে চলিতে হইবে, নতুবা সব ফাঁকা হইয়া যাইবে!

ও গণেশ! এস—এক জন ডাকিল—আমি তাহাকে জীবনে কখন দেখি নাই, সে আমাকে গণেশ বলিয়া কি করিয়া অবগত হইল! "এস আমার সঙ্গে—গৌরাঙ্গ চৌধুরী মহাশয় ডাকিতেছেন।" আমি, সেই আগন্তুকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দেখি, গৌরাঙ্গ একটী গৃহে বসিয়া আছেন। এ কাছারী বাড়ী হইতে অনেকটা দূরে, গ্রামের মধ্যে, খাড়ীর তীরে একটা সুন্দর বাড়ী। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—স্নান করিয়া এস, তোমার আহার প্রস্তুত হইয়াছে। আমি মহানন্দার শীতল জলে স্নান করিয়া আসিলাম, পথে বস্ত্র রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইয়া ছিলাম। আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, আমার সহিত গৌরাঙ্গ চৌধুরীর কোন কথাই হইল না, আমার মনে কেমন সন্দেহ হইল। গৌরাঙ্গ চৌধুরী কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমার মুখের দিকেই দেখিতেছেন—আহারের পর বিশ্রাম করিলাম, কোন কথাই নাই। অপরাহ্নে কাছারী চলিয়া গেলেন, আমাকে কিছুই বলিলেন না। আমিও কাছারী গেলাম, সেই কম্বলে বসিলাম। কাছারীটাতে যে একটা বিরাট ব্যাপার সাধিত হয়, তাহা ত আদৌ বুঝিলাম না। গৌরাঙ্গ যে একজন জমকাল নায়েব, তাহারও, কিছু পরিচয় পাইলাম না। একবার মনে হইল এখানে কিছুই হইবে না,

আবার ভাবিলাম, কোন কিছু করা নেহাত ছেলে খেলা নহে; কাঞ্চন পথে পড়িয়া থাকে না—ফেলিয়া রাখার মত করিতে হয় তবে পথে পড়িয়া থাকে। জল চাহিলেই বৃষ্টি পড়ে না—বীজ পুতিলেই ফল ধরে না—সময় ও সাধনার প্রয়োজন—ব্যাস্তবাগীশ হইলে চলিবে না—স্থীর, ধীর, গম্ভীর হইতে হইবে। ফশ্ করে একটা চাল চালা ভাল নয়, চাল দেখিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া তবে চাল চালা ভাল। দেখিনা আমাকে কোন্ চক্ষে গৌরাঙ্গ দেখেন; এমনও হইতে পারে শব-সাধনার শব হইতে পারি, না হয় উত্তরসাধক, না হয় চেলা, না হয় সাধক করিয়া দিতে পারেন!

আমার সঙ্কল্প যেন স্থির থাকে, প্রতিজ্ঞা যেন অচল থাকে, তাহা হইলেই আমি জয়লাভ করিব। জয়লাভ করিব—জয়লাভ করিতেই হইবে, এই ইচ্ছাই আমার হৃদয়ের সমুদায় অংশ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে।

সূর্য্য অস্তপ্রায়, কাছারীতে যাহারা আসিয়াছিল একে একে তাহারা চলিয়া গেল। কাহার কাজ সারা হইল, কাহার কাজ সারা না হইতেই কাজ বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আমি এখন আশায় বসিয়া আছি—আশা লইয়াই কাছারির কম্বলে বসিয়া আসি। একজন আসিয়া নায়েব মহাশয়ের নিকট প্রদীপ দিয়া চলিয়া গেল। নিকটে কেহ নাই, কাছারীর বাহিরে জনকয়েক বরকন্দাজ বসিয়া গল্প করিতেছে। ত্রিসন্ধ্যা যাহাকে বলে, ঠিক সেই সময়ে গৌরাঙ্গ বলিলেন—গণেশ, কি মনে করে এলি।—তার ত কিছুইত বল্‌লি না? আমি আর কি বলিব আপনি কি দেশের অবস্থা দেখিতেছেন না।—তা দেখিতেছি, কিন্তু দেশের অবস্থার সহিত তোমার অবস্থার কতটুকু মিল আছে, আর কতখানি বেমিল আছে তাহাত বুঝা যায় না! তোমার পিতার মৃত্যুর বিষয় যাহা অবগত আছি,

সঠিক বল—আমি শুনিতে চাই। আমি পূর্ব্ব ইতিহাস হইতে পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের পারিবারিক ঘটনা ও দেওয়ানজীর অত্যাচার হইতে বর্ত্তমান ভগবানপ্রসাদের অত্যাচার পর্য্যন্ত বলিলাম। তিনি মাঝে মাঝে কোথাও 'হুঁ' কোথাও 'তারপর' ইত্যাকার কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা বলেন নাই বা তাঁহার মুখ দেখিয়া কোন ভাব বুঝিতেও সমর্থ হই নাই। যখন আমার পারিবারিক ইতিহাসের বর্ত্তমান অধ্যায় পর্য্যন্ত শেষ হইল, তখন তিনি বলিলেন—"দেখ গণেশ, শিক্ষার দোষে আমাদের দুর্দ্দশা দিন দিন বাড়িতেছে, আমরাই আমাদের দুর্দ্দশা ডাকিয়া আনিতেছি। এটাও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়—এই আমাদের দুর্দ্দশা দিন দিন বাড়িবে বই কমিবে না। নাদিরশার মত অনেক নাদিরশা, আমাদের দেশে জন্মিয়াছে—সময় ও অবস্থার অভাবে তাহাদের কীর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে না। আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে নাদিরশা, অওরংজেব, সিরাজ, মিরজাফর, অনেক আছে; বরং নাদির ভাল তবুও মিরজাফর ভাল নহে। বর্ত্তমান কালের পূর্ব্বে, প্রজাপীড়ন দ্বারা বাদশাহী নফরের ঐশ্বর্য্য লাভের কথা অনেকেই অবগত আছে—দেখিয়াছে এমন লোকও আছে। জোর যার মুল্লুক তার, দশকে না মারিলে, একজন কদাচ বড় হইতে পারে না। মানুষ মারিয়া, ভীষণ অত্যাচার করিয়া রাজ্য শাসন করিতে হয়—এই নীতিটা এদেশের মধ্যে বিলক্ষণ আছে। সুশাসনে রাজ্য রাখিতে হইলে প্রজার প্রাণে ভীষণ আতঙ্ক জাগাইয়া দিতে হইবে। প্রজাকে ভয়ে ভয়েই আধমরা হইয়া থাকিতে হইবে—চতুর্দ্দিকে শাসনের ছোরা ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে—অত্যাচারের আগুন জ্বালিয়া রাখিতে হইবে। ধনে প্রাণে মানে প্রজাকে মারিতে হইবে। মাতব্বর প্রজাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে—না হয় তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, আকাশে তুলিয়া মাটিতে আছড়াইয়া দুই পায়ে দলাইতে

হইবে। জমিদারীর মধ্যে কোন প্রজাকে বড় হইতে দিতে হইবে না। দেনার জ্বালায় ছোট বড়কে ব্যাকুল করিয়া রাখিতে হইবে।

বর্ত্তমান বাঙ্গালার জমিদারগণের মধ্যে কেহ কেহ ছোট খাট পাদশাহ, কেহ কেহ দিল্লীর পাদসাহ, অধিকাংশ মুরসিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলা। আমাদের আদর্শ যে উহারাই। অর্থ, বিলাসিতা ও সুন্দরী উপভোগ গর্ব্ব, অহঙ্কার অপমান বোধ যাহাদের মজ্জাগত—আত্মসুখ ব্যতীত যাহারা অন্য কিছু জানে না—হিংসা, দ্বেষ, ক্রুরতা ভিন্ন যাহাদের ব্যবসা নাই—তাহারাই আমাদের আদর্শ! দু পয়সা হইলেই "নবাবী ফলাই"। জমিদারগণ এদেশের প্রায়ই বিলাসী—পারিষদগণ ক্রূর, বর্ব্বর, স্বার্থপর ও মূর্খ; সুতরাং যেমন দেবতা, তাহার পূজা তদ্রূপ না হইলে বর লাভ অসম্ভব। গণেশ, এখন নবাবী আমলের চাল চলন, সভ্যতা লইয়া আমরা চলিতেছি। দুদিন পরে, কোম্পানী বাহাদুরের কেদেঙ্গারীগুলি এই আদর্শের উপর নূতন আদর্শ গড়িয়া তুলিবে। দেশটা এখন যেমন আছে, পরে সভ্যতারূপী বর্ব্বরতার উৎপাতে আমাদের ভাবি বংশধরগণ একেবারে নিষ্পেষিত হইবে। ইহা অপেক্ষা শত অত্যাচারে তাহারা উৎপীড়িত হইবে। মহারাজ নন্দকুমারের বিচারের মত বিচার, ইতিমধ্যেই এদেশের জমিদারগণ প্রজার উপর আরম্ভ করিয়াছে! ভগবানপ্রসাদ রায়চৌধুরী, তোমার পিতার উপর অত্যাচার করিতে গিয়া তোমার পিতার মৃত্যু ঘটাইয়াছে। ইহা সত্য! দেখ বাপু ডাকাতের ছেলে প্রায়ই ডাকাত হয়, ঘাতকের ছেলের ব্যবসা ঘাতকগিরী। পিতার গুণ পুত্রে বর্ত্তায়। বিষের পুত্র কখন সুধা হইবে না, সে বিষ লইয়াই জন্মিবে। তোমার মাতার কোন সন্ধান পাইয়াছ কি?"—না মহাশয়! 'এখন আর ঐ রকম রমণীহরণ ব্যাপারের কথা কি শুনিয়াছ?' ছোট লোকদের মধ্যে শুনিতেছি যাহারা নবযুবতী—অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কারের

প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে অসৎ পথে লইয়া যাইতেছে। দুই চারি জন ভদ্র ঘরের স্ত্রীও নাকি প্রলোভনে পড়িয়া নষ্টা হইয়াছে। এই ব্যাপারেই ত ভগবানপ্রসাদ কুৎসিত পীড়ায় ভুগিতেছেন। দরিদ্র এবং নীচ জাতীয়া রমণীগণের প্রতিই জমিদাররের অত্যাচার অতিরিক্ত। এমন কি হাড়ী, ডোম, মুদ্দফরাসের যুবতীগণও উহার নিকট অব্যাহতি পায় না। শুনিতেছি নাকি জমিদার, ধাতুদৌর্ব্বল্য পীড়ায় পীড়িত হইয়াছেন। সেই জন্য অনেক যুবতী রমণীর প্রয়োজন হইয়াছে। ছোট লোকদের স্ত্রীদিগকে কৌশলে অথবা জোর করিয়া, অন্তঃপুরে তাঁহার নিকট রাখা হইয়াছে। পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, আরোগ্যের আশা নাই। গৌরাঙ্গ বলিলেন—"বুঝলে গণেশ—ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারের নিকট সকলের যুক্তি তর্ক ব্যর্থ হইয়া যায়। অত্যাচারীর জীবনে ভবিতব্য হইতে বিধান নামিয়া আইসে—তাঁহার অব্যর্থ বিধানে দুষ্টকে পড়িতেই হয়। সে বিধানের সে শাস্তির প্রতিকার মানবের অসাধ্য। বিধাতার মার—চরম শাসন!"

"ভগবানপ্রসাদের অত্যাচার আরও ভীষণ হইত—যদি তাহার বংশ থাকিত। বর্ত্তমানে তাহার ঐ কুৎসিত ব্যাধির জন্য তাহার মনে আতঙ্ক হইয়াছে যে, সে নিঃসন্তান থাকিয়া গেল—বংশ রক্ষা হইল না। ভগবান কি ঐ দুষ্টবংশ রাখেন! রাবণের বংশে বাতি দিতে কেহই ছিল না। ভগবানপ্রসাদ বা দাওয়ানের বংশে বাতি দিতে কেহ থাকিবে না। ভূত ভোজন হইবে। অসৎ উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ ভূতে খাইবে ভূতেরা নৃত্য করিবে।"

"তোমার পিতার প্রতি অত্যাচারে তোমার মনে মর্ম্মান্তিক যাতনা হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। ভগবানের উপর নির্ভর ব্যতীত অন্য উপায় দেখিতেছি না। তুমি আমি কি অমন একটা দুর্দ্দান্ত জমিদারের

কিছু করিতে পারি? ভগবান দুষ্টের দমন করিবেন, কেমন গণেশ! মনকে প্রবোধ দিতে পারিয়াছ কি?" আমার মনে, কথাগুলি কেমন কেমন ঠেকিল, আমি বলিয়া বসিলাম—এ জীবনে কি প্রবোধ দিতে পারিব? আমি ক্ষুদ্র, দরিদ্র বটী কিন্তু আমার হৃদয় ও সাহস ক্ষুদ্র নহে! জমিদারের অত্যাচার অপেক্ষা প্রবল বলিয়াই মনে করি।"

"তুমি কি করিবে, অগ্নির নিকট তৃণের ন্যায় দগ্ধ হইবে যে!" আমি বলিলাম—তাহাও ভাল, অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশের কিছু যদি উপকার করিতে পারি, তাহা করিতেই হইবে—জমিদারের শাসন, সম্ভব কি অসম্ভব তাহা ভাবিতে পারিতেছি না—কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক উহাকে নষ্ট করিবই করিব।

গৌরাঙ্গ-চৌধুরী, যেন একটু ক্রোধের সহিতই বলিলেন—তুমি জান আমি জমিদারের নায়েব—আমার সাক্ষাতে ও কথা বলিতে তোমার ভয় হইল না! তুমি জমিদারের একজন নায়েবের নিকট জমিদারকে শাসন করিতে চাও, সাবধান হইয়া কথা বলিতে শিক্ষা কর—তোমার বিপদ তুমিই ডাকিতেছ! আমি বলিলাম, "আমার সাহস আছে বলিয়াই বলিতেছি, আমি মৃত্যুকে আদৌ ভয় করি না!" মৃত্যুকে ভয় করে না এমন কে আছে! তোমার অত সাহস ভাল নয়! আমি বলিলাম, "আমার জীবনে মমতা নাই! বলিয়াইত ঐ কথা বলিতেছি। আপনি জানিবেন, আপনার জন্মভূমি মালতী-কুঞ্জের আমি প্রজা—আমি অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচার করিব। তাহাকে নিপাত করিবই করিব।" নায়েব মহাশয় বলিলেন—এই জন্য যদি আমার নিকট আসিয়া থাক তাহা হইলে অন্যায় করিয়াছ! আমি বলিলাম—ন্যায়কে যদি আপনি অমান্য করেন—তবেই আমার এখানে আসা ভুল হইয়াছে, নতুবা হয় নাই।

গৌরাঙ্গ চৌধুরী বলিলেন—তোমাকে আমি ছোট ভাই বলিয়া ভাল

বাসি, কিন্তু এত সাহস ভাল নয়; তুমি জান, জমির খাজনা শোধ না করিলে, হয় ত তোমাকেও তোমার পিতার মত হইতে হইবে। খাজনা শোধের কোন উপায় করিয়াছ কি! যদি তাহা না করিতে পার তাহা হইলে তোমাকেও মরিতে হইবে। তোমার সকল বুদ্ধি ঐ স্থানেই মাটী হইবে। আমি বলিলাম—আমার জমি জমা, ঘর বাড়ী না হয় জমিদার লইবে আমি কিছুরই মায়া করি না, প্রাণেরও নয়, যদি মরিতে হয় তাহাও ভাল।

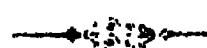
নায়েব ধীরে ধীরে বলিলেন—তোমার খাজনা পরিশোধ করিতে হইবে—পিতার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, এখন টাকার প্রয়োজন—টাকা সংগ্রহ কর। আত্মরক্ষা কর, পরে যাহা হয় করিও। তোমাকে আমি শাসন করিতে চাই না।—আমার টাকা নাই, আমি কি করিয়া খাজনা দিব, পিতার পিণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারিব কি না তাহাও ভাবি না। আমি ভাবিতেছি কেবল প্রতিহিংসা! অরণ্যে রোদন করিয়া পিতৃদায় হইতে অব্যাহতি লইব!

"বেশ কথা, প্রতিহিংসা সম্পাদনে সমর্থ হইলে করিও, অগ্রে জাতি রক্ষা কর, পিতার পিণ্ড দাও।" আমি বলিলাম উপায় নাই। গৌরাঙ্গ বলিলেন—আমি তোমাকে টাকা দিব, তুমি খাজনা পরিশোধ করিয়া দাও, নিজে জমিদারী কাছারীতে গিয়া—জমিদারের সাক্ষাতে খাজনা দাও, জমিদার কেমন একবার চক্ষে দেখ, পিতার শ্রাদ্ধ কর; তাহার পর আমার নিকট আসিও আমি চাকরী দিব। এই জমিদারের চাকরী করিতে রাজি আছ! আমি আনন্দের সহিত বলিলাম—নিশ্চয় রাজি আছি। "আমার প্রভুকে তুমি প্রভু বলিয়া স্বীকার করিবে!" আমি বলিলাম—করিব, কিন্তু প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্যই প্রভু বলিয়া স্বীকার করিব। কাঁটা দিয়াই কাঁটা তুলিব।

"চাকরীর মায়ায় তাহা ভুলিয়া যাইবে, যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা করিও—তুমি আমার আশ্রয় লইয়াছ—তোমাকে বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধার করিব। তাহার পর তুমি আছ, আর তোমার কর্ত্তব্য আছে। রাত্রে তোমাকে আমি টাকা দিব। কল্য প্রত্যুষে তুমি কোদলাবাথানের সদর কাছারীতে গিয়া টাকা জমা দিবে তবে বাড়ী যাইবে। শ্রাদ্ধের পর এখানে আসিও, পরে তোমাকে ভগবানপ্রসাদের চাকর নিযুক্ত করিব।"

অনেক রাত্র হইয়াছে, উভয়ে উঠিয়া বাড়ী যাইলাম। রাত্রে আহারাদি করিয়া শয়ন করিবার সময় গৌরাঙ্গ চৌধুরী আমাকে দুইশত টাকা দিয়া বলিলেন—প্রত্যুষে উঠিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া চলিয়া যাইবে। আমি তোমাকে টাকা দিয়াছি তাহা তুমি জানিলে ও আমি জানিলাম আর যেন কেহ না জানিতে পারে।

নবম পরিচ্ছেদ



জমিদারের কাছারী

"ত্রাসে লাজে নতশির নিত্য নিরবধি
অপমান অবিচার সহ্যকরে যদি
তবে সেই দীন প্রাণে তব সত্য হায়
দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হয় !"

(রবীন্দ্র)

সুখতারার সহিত ক্ষীণ চন্দ্র পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়াছে। এখন ধরণীর অন্ধকার বিদূরিত হয় নাই। আমি রহিমগঞ্জ ছাড়িয়া সদর কাছারী অভিমুখে চলিয়াছি। এ পর্য্যন্ত আমি ভগবানপ্রসাদ জীবটির আকৃতি দেখি নাই। আজ দেখিব—মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছে। দ্রুত চলিয়াছি, বামে আমার জন্মভূমি মালিগঞ্জ পড়িয়া রহিল, দূর দিয়া চলিয়াছি। এক প্রহর বেলার মধ্যেই যমের বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলাম। যমালয়ের দ্বার দক্ষিণ মুখে—দক্ষিণ দ্বার দিয়া সদরকাছারীতে প্রবেশ করিলাম। কাছারী বসিয়াছে—দরজার পার্শ্বে শওয়া হাতের নাগরা জুতা ঝুলিতেছে। ঢাল তলোয়ার লইয়া দুইজন পাইক পাহারা দিতেছে। আমার মনে হইল পিশাচের রাজ্যে পিশাচগণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পিশাচের দরবার বসিয়াছে—সদর

নায়েব, খাজাঞ্চি প্রভৃতি বার দিয়া বসিয়া আছে। দৈব দুর্ব্বিপাকে বা আমার পুণ্যবলে, সেদিন স্বয়ং পিশাচরাজ ভগবানপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রেত মূর্ত্তিতে পৃথক্ প্রেতাসনে বড় একটা তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে, আলবোলার শট্‌কা মুখে রহিয়াছে। লোকটার চেহারা মন্দ নয়—কিন্তু স্বভাব এ প্রকার কেন ?

আমি ধীরে ধীরে যমরাজার নিকটে গিয়া দুইটি টাকা নজরানা দিয়া প্রণাম করিলাম। জমিদার আলবোলার নলটি মুখ হইতে সরাইয়া বলিল,—"তোর নাম কি" ? আমি বলিলাম,—হুজুর মালিক ধর্ম্মাবতার —আমি আপনার প্রজা ৺ দীননাথ গণেশের পুত্র—গণেশ।

নায়েব বলিল—খাজনা দিতে আসিয়াছ ? আমি, তাঁহাকে একটি টাকা নজরানা দিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিহাম—আজ্ঞে হাঁ।

পাইক বলিল—ঐখানে বস। লম্বা মাদুর পাতা আছে, তাহার উপর বসিলাম। আমি শান্ত শিষ্ট ভাবে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় মাদুরের এক প্রান্তে বসিলাম। তখন আর কোন প্রজা দরবারে হাজির হয় নাই। দাওয়ানজী বা সদর নায়েব বলিলেন—সমুদায় খাজনা মিটাইয়া দিবে ? আমি করজোড়ে বলিলাম—আজ্ঞে হাঁ।—উত্তর পাইলাম—বেশ !

পিশাচ-প্রকৃতি ভগবানপ্রসাদ বলিল—দীননাথের অপেক্ষা তাহার পুত্র ভাল লোক দেখছি ! নায়েব বলিলেন—আপনার অনুগ্রহে গণেশ ভাল লোক হইয়াছে। মালিগঞ্জের প্রজাগুলা মন্দ নয়, কেবল দীননাথ ব্যাটা পাজির পা ঝাড়া ছিল ; গণেশ ভাল লোক। আজকালকার ছেলেছোকরারা বাপ দাদাদের অপেক্ষা ভদ্র। যত বুড়ো দেখ্‌বেন—সব শালারা পাজী। প্রজা ঠাণ্ডা হবে, জমিদার যা যখন হুকুম কর্‌বেন, তা তখনি কর্‌বে, তবে না প্রজা !—প্রজার দুষ্টামি কি সহ্য হয়, দেখ্‌ছি সব প্রজা শালারা বদমায়েস্—নচ্ছার ! যেমন কুকুর তেম্‌নি মুগুর না পড়লে কি কুকুর

পোষ মানে! প্রজা রাখ্তে হবে জুতার তলায়! বেটারা মাথা তুলে কথা বল্বে! 'টুঁ'টী পর্য্যন্ত যাতে না কর্তে পারে তা কর্তে হবে; তবে জমিদারী শাসন হবে। এই প্রকার প্রজাহিতৈষী জমিদার পুঙ্গবের সুদক্ষ সদর নায়েব, প্রজার গুণ-কীর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময়ে কালিকাপুরের বলরাম বিশ্বাস, হুজুর দরবারে হাজির হইয়া, জমিদার সকাশে দুইটাকা নজরানা দিয়া প্রণাম করিল। বলরাম বিশ্বাস বৃদ্ধ—মাথায় একগাছিও চুল কাল নাই—দাঁত নাই। জমিদার কথাটি বলিলেন না। সদর নায়েব বলিলেন—কি হে বলরাম! বুড়ো হয়ে কি ভীমরতি ধরেছে নাকি? বলরাম নায়েব মহাশয়ের চরণে একটী টাকা প্রণামী দিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক করজোড়ে দাঁড়াইল। নায়েব বক্রদৃষ্টিপূর্ব্বক বলিলেন—ব্যাটা পাজীর পা ঝাড়া, বুড়ো বদমায়েস! বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল—কেহ তাহাকে বসিতে হুকুম করিল না, সুতরাং বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া রহিল। আমি জানি, বৃদ্ধ সৎলোক, কাহারও অনিষ্ট করে না, তত্রাচ এ দরবারে তাহার অপমানের চূড়ান্ত হইল!

আমি বসিয়া যেন অভিনয় দেখিতেছি। অনন্ত মুখোপাধ্যায় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন—নিবাস কালিকাপুর—যুবক—ধনী সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। দরবারগৃহে প্রবেশ করিয়া জমিদারের নজরানা পাঁচ টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন। জমিদার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। নায়েব বলিল—অনন্তের যে বড় অনুগ্রহ দেখছি! যুবক দুইটী টাকা প্রণামী দিয়া প্রণাম করিলেন। নায়েব হাতের কলম রাখিয়া বলিলেন—যুবক গুলোর মত নচ্ছার দুনিয়ায় নাই! বদমায়েসী কর্বার আর জায়গা পাও নাই? ব্যাটার ঘাড়ে কটা মাথা দেখ্তে হবে! ব্যাটা বলে কিনা—জমিদার খাজনার মালিক, শাসন কর্বার কে?—ছুঁচোর কিচ্ মিচি সহ্য হয় না—জমিদার তোর বাবা, তা জানিস্? শাসনের

কে ?—ব্যাটার আস্পর্দ্ধার কথা শোন। তোর স্ত্রীর পর্য্যন্ত মালিক জমিদার, শালা বদমায়েস! ডাকিলেন 'কালু'। ডাকিবামাত্র যমদূত-প্রায় পাইক আসিয়া নায়েব বাবুকে প্রণাম করিল।

বেটা বামুনকে আশীর্ব্বাদ করে দে। কালু, অনন্ত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরিল। অনন্ত কালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল। দূরহ গোলাম! নায়েব মহাশয়, গভীর গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—শালাকে নিয়ে যা! আরও চারিজন পাইক আসিল—অনন্তকে ধরিয়া দূরে লইয়া গেল, শওয়া হাতের নাগরা জুতার বাড়ী, তাহার পৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিল। যুবক নীরবে সহ্য করিল—এদৃশ্য অতি ভীষণ ও হৃদয়বিদারক। চৌদ্দ ঘা জুতার বাড়ী পড়িল—পিঠ ফাটিয়া ব্রাহ্মণের শোণিত গড়াইয়া পড়িতেছে, চক্ষু আরক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। নায়েবের নিকট পুনরায় হাজির করিল।

জমান-নবীশ অনন্তের খাজনার হিসাব দাখিল করিল—খাজনা বকেয়া বাকী নাই, হাল খাজনা—এখন পুণ্যাহ হয় নাই। তত্রাচ সুদের সুদ, দশটী বাব বাবতে ও তদুপরি জরিমানায় মোট খাজনা পাঁচ-শত হইল—শুনিলাম প্রকৃত খাজনা পঞ্চাশ টাকা মাত্র। অনন্ত টাকা গণিয়া দিল। জমিদার বলিলেন—ফারখতি এখন পাইবে না, পুণ্যাহ হইলে পাইবে। খবরদার! আর কখন জমিদারের উপর কথা বলিও না। বাস্ত-বাড়ীর খাজনা কত ছিল? জমান-নবিশ বলিল আট টাকা। জমিদার বলিল—এত কম!—এবার হইতে আশীটাকা দিবে, একটী কথাও বলিও না যাও। অনন্ত চলিয়া গেল।

দেখিলাম নায়েব বাবুর কথার মূল্য যথেষ্ট—এই বলিতে শুনিলাম যুবকগণ ভালি মানুষ, বৃদ্ধেরা বদমাইস—এই দেখিলাম যুবকগণ বদমাইস, আরও কত দেখিব। বৃদ্ধ বিশুমণ্ডল আসিলেন—জমিদারকে নজর

দিলেন না, প্রণাম করিলেন। নায়েব বাবুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইবা মাত্র নায়েব বলিলেন—কি খবর? উত্তর হইল—খবর ভাল। পুনশ্চ নায়েব বলিলেন—জোগাড় হয়েছে? উত্তর হইল, তিনটী হইয়াছে—বয়স অল্প, দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল। জমিদার মহাশয় একগাল হাসি হাসিয়া ডাকিলেন—বিশু! বিশু বলিলেন—হুজুর! জমিদার বলিলেন—আমার নিকট বস। বলি কেমন—খুব ভাল? আজ হবে?—আজ্ঞে এখনি। নায়েব বাবু বলিলেন—বৃদ্ধ হলে দুধমরে ক্ষীরটুকু হয়। এমন ভদ্রলোক আপনার জমিদারীর মধ্যে নাই। বৃদ্ধ মাত্রেই লোক ভাল। যত নষ্টের গোড়া যুবক-সম্প্রদায়! আমার মনে হয়, যুবকগুলোকে মাটীতে পুঁতে ফেলি। আমি জানি বৃদ্ধ বিশুমণ্ডল গ্রামের গোয়েন্দা, কুট্টিনীর কার্য্য করে, বিবাদ বাধায়, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, দেশের অনিষ্ট করে, লাগান ভাঙ্গান ইহার ব্যবসা, ভাতৃ-বিরোধ বাধাইতে ওস্তাদ—তাহারই দরবারে খোশনাম!

বিশু মণ্ডলের তিন বৎসরের খাজনা বাকী—তাহার উপর জুলুম নাই, খাজনার তাগিদ নাই। বৃদ্ধ বদমায়েস, জমিদারের অতি প্রিয়! তৎপরে শুনিলাম, জমিদার মহাশয় পোষ্য গ্রহণ করিবেন—তাহার আয়োজন হইতেছে। দু দশ দিনের মধ্যে এই কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইবে। আমার দশ টাকা হাল খাজানার স্থলে পঞ্চাশ টাকা দিতে হইল—ফারখত্তি পাইলাম না। বাড়ী যাইবার হুকুম হইল। আমি বাড়ী আসিলাম, বেলা তখন দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে।

আমার ভাবনার মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে—এখন ভাবিতেছি—জমিদার বড়, না সদর নায়েব মহাশয় বড়!—এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। এখন বড় কে? একা জমিদার—না একা নায়েব—না দুই জনই বড়—ছোট কেহই নাই? আমি রাজনীতিজ্ঞ

ফেরপ্যাচে এ পর্য্যন্ত পড়ি নাই—রাজার দরবার সন্দর্শন করিয়া নায়েব-রূপী মন্ত্রী ও স্বয়ং জমিদাররূপ রাজার কায়দা, কসরৎ দেখিয়া গেঁয়ো রাজনীতির সমস্যার মধ্যে বা হেঁয়ালীর মধ্যে পড়িয়াছি। এই বানর-রাজনীতি, অতি দুরূহ, দরবারের বিচার-প্রণালীও দ্বৈতাদ্বৈতবাদে পূর্ণ। মূর্ত্তি দুইটী একই, অর্থাৎ জমিদার ও নায়েব বিভিন্ন নহে, পূর্ণ কলি-মূর্ত্তি; সুতরাং অদ্বৈতবাদ এই স্থানে আসিয়া পড়িতেছে। কলি-মূর্ত্তির এপিঠ জমিদার ওপিঠ নায়েব—এক বস্তু দুইটী হইয়াছে! যথার্থ বলিতে হইলে বলিতে হয় একটী মূর্ত্তি পাপের বাহ্যরূপ, অন্যটা পাপের আভ্যন্তরিক রূপ। জমিদারকে ছাড়িলে নায়েবের অস্তিত্ব থাকে না, আবার নায়েবকে ছাড়িলেও জমিদারের অস্তিত্ব বজায় থাকে না। জমিদার আছেন, তাই নায়েব বিদ্যমান রহিয়াছে। নায়েবের বিদ্যমানতা দেখিয়া, জমিদারের বিদ্যমানতা উপলব্ধি হইতেছে যথেষ্ট চিন্তা করিয়া দেখিলাম, প্রকৃতিগত বিভেদ কিছুই নাই। বাহ্যতঃ মূর্ত্তিভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু প্রকৃতিগত রন্ধ্রপথে দেখিলে—দুই একটা দেখায়! এক্ষণে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মধ্যে পড়িয়া আকুল হইয়া পড়িলাম। এই ভাবনার উপর নূতন ভাবনা আরম্ভ হইল—চিৎ ও জড় লইয়া। জড় ছাড়া চিৎ নাই—চিৎ ছাড়া জড় নাই! এই ভাবনা আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। কেন এ ভাবনা আসিল —কেন ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলাম, ঠিক উত্তর দিতে পারিব না।

পাপ ছাড়া পাপী থাকিতে পারে না এবং পাপী ছাড়া পাপও থাকিতে পারে না—একটীকে ছাড়িলে অপরের অস্তিত্বই থাকে না—দুই-ই থাকে না। পাপ ও পাপী, পাপী ও পাপ একই কিন্তু একটা জড় একটা চিৎ। এক্ষণে জড় ও চিৎ লইয়া বিশ্ব চলিতেছে, কোদলাবাথানের জমিদার জড়, কি নায়েব চিৎ তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। এই প্রকার জড় ও চিৎ লইয়া

বিচার করিতেছি, এমন সময়ে মনে হইল—একটাকে চিৎ করিয়া দিলেই ত অপরটা জড় হইবে! অথবা একটাকে জড় করিয়া দিলে—অপরটা চিৎ হইয়া পড়িবে! সুতরাং স্থির করিলাম—একটাকে চিৎ করিয়া দেওয়া হউক। যদি নায়েবকে চিৎ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে জমিদারটা আপনা হইতেই জড় হইয়া যাইবে। অথবা যদি জমিদারকেই জড় করিয়া ফেলি, তাহা হইলে চিৎ দিকটা অবশ্য চিৎ হইয়া পড়িবে। চিৎ ও জড় যথার্থ প্রমাণ হইবে। দ্বৈতাদ্বৈত ভাবটা আর আত্মগোপন করিতে পারিবে না। হঠাৎ আমার মনে হইল চিৎ ও জড়ে বড় প্রভেদ নাই।

এমন সময়ে বন্ধুবর অনাথ আসিয়া উপস্থিত। অনাথ আমার গভীর চিন্তার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি চিৎ ও জড়ের এবং বড় ও ছোট ভাবলহরীর কথা বলিলাম। অনন্ত একটু হাসিয়া যাহা মীমাংসা করিয়া-দিল তাহা অতি অল্পের মধ্যে, অথচ 'না' করিবার উপায় নাই। আমিও কতকটা উহার মীমাংসার দিকেই গিয়াছিলাম। আমার আজিও মনে আছে, অনাথবন্ধু বলিয়াছিল—প্রহাররূপ বল দ্বারা প্রাণবায়ু বহির্গত হইলেই চিৎ হইয়া পড়ে—তখনকার অবস্থার নাম চিৎ অবস্থা এবং অবস্থিতটাকে জড় বা মৃতদেহ বলা যায়। এই উপায় ব্যতীত চিৎ জড়ের বিশ্লেষণ হইতেই পারে না। আর দেখ, প্রহারটা বড়গোছের হইলে চিৎটা ছোট বা নাই হইয়া যায়, জড়টা লম্বা বা বড় হইয়া পড়িয়া থাকে! সুতরাং ছোট কে, বড় কে, তাহারও মীমাংসা হইয়া যাইবে। আমাদের দুই বন্ধুর মত যখন এক হইয়া গেল, তখন দ্বৈতবাদ প্রনষ্ট হইয়া, অদ্বৈত-বাদে উপস্থিত হইল। অনাথ বলিয়াছিল—দেখ ভাই গণেশ! বুদ্ধি-শক্তির যে কারিগরি আছে, তাহাতেই কল্পনার সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে পারে। এই যে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, তাহাতেও বুদ্ধিশক্তির কারিগরি বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। এই বুদ্ধির মারপ্যাচটার মধ্যে

চালাকিটাই কারিগরি। তবে যে, না ঠকিতে হয় তাহা নয়! সব্‌টা বিশ্বাস করা উচিত নয়। যতই দিন যাইতেছে, ততই বুদ্ধির দৌড় ও শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু বুদ্ধিকে আয়ত্তাধীন রাখা চাই—বুদ্ধির মুখে লাগাম না থাকিলে ভীষণ অনর্থ উৎপাদন করে। বুদ্ধিটা আবার কয়েক প্রকার ভৌতিক উপায়ে স্তিমিত বা বিধ্বস্ত হইয়া যায় বা জড়ীভূত হইয়া পড়ে। 'প্রবল ন্যায়' বলিয়া একটা কিছু আছে—উহার হস্তে পড়িলে অনেকেরই বুদ্ধি চিৎমার্গ ত্যাগ করে। বুদ্ধি, চিৎ বা জড় হইতে পৃথক হয়—সুতরাং অস্তিত্ব বোধ হয় না। প্রহার, শাসন প্রভৃতি প্রবল ন্যায়ের অঙ্গ বা মূর্ত্তি। জোর জবরদস্তি তাহার প্রতিবিম্ব। প্রবল ন্যায়ের হস্তে পড়িলে হাঁ, না হইয়া যায় না, হাঁ হয়। এই ন্যায়শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে শিক্ষা করা উচিত।

দশম পরিচ্ছেদ



ভূয়োদর্শন

"আলো আসে দুয়ারের ফাঁকে,
রক্ত-চক্ষে চাহিছে প্রভাত ;
সংসারের তোরণের 'পরে
ডঙ্কা'পরে পড়িল আঘাত।"
(কালিদাস)

সন্ধ্যা হইয়াছে, দুই বন্ধুতে মালতীকুঞ্জের নিকট বসিয়া আছি। অনাথ বলিল—পল্লীর মধ্যে যাহারা মাতব্বর, তাহারা পল্লী ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিলে পল্লীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। একা গৌরাঙ্গ চৌধুরী যদি এই মালতীকুঞ্জ আলো করিয়া থাকিত, তাহা হইলে এই মালিগঞ্জের অবস্থা এমন শোচনীয় হইত না। আমি তাহার উত্তর দিলাম—একথা সত্য কতকটা হইতে পারে, কিন্তু মিথ্যাও যে নয় তাহারই বা প্রমাণ কি ? সত্যের মধ্যে মিথ্যা নাই এবং মিথ্যার মধ্যে সত্য নাই, একথা আমি বিশ্বাস করি ; কিন্তু আমরা যাহা দেখি, তাহা খাঁটি বা প্রকৃত কিনা তাহার মীমাংসা আমি এ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই। খাঁটি সত্য এবং খাঁটি মিথ্যা আমার দৃষ্টিপথে এখনও পর্য্যন্ত পড়ে নাই! যাহা পড়িয়াছে তাহার সবগুলাই ভেজাল, খাঁটি নহে! সবই মেকী!

গৌরাঙ্গ চৌধুরী মালতীকুঞ্জে নাই বলিয়া যদি মালিগঞ্জ পতিত হইয়াছে ধরি, তাহা হইলে থাকিলেও হয়ত গৌরাঙ্গ চৌধুরীই পতিত হইত— আমাদের মত হইত কি না বুঝিতে পারিতেছি না ! মালিগঞ্জকে গৌরাঙ্গ চৌধুরী উন্নত করিত, কি আরও অবনত করিত তাহার প্রমাণ উপস্থিত হয় নাই। প্রমাণের মুখে টিকিয়া যাইলে তবে একথা বলা চলিত। অনুমানের উপর সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কার্য্য দ্বারা যাহা প্রমাণীকৃত হইবে, তাহাই আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। পরীক্ষিত সত্য-নীতি, কল্পনা-প্রসূত নীতি হইতে বলবত্তর ইহা আমি বুঝি। অনাথ বলিল—ভূয়োদর্শন বলিয়া একটা কথা আছে। সূর্য্য উঠিলে অন্ধকার অপগত হয়, ইহা স্বীকার কর কিনা ? অবশ্য করি। ইহা ভূয়োদর্শন জনিত কেমন ? মানুষ মরে ইহা স্বীকার কর কি না ? করি।—এটাও ভূয়োদর্শন। তদ্রূপ বুদ্ধিমান ধনীর বাসস্থান, উন্নত হয় ইহা স্বীকার কর কিনা ? আমি বলিলাম—না। তাহার প্রমাণ ভগবানপ্রসাদ—অর্থশালী জমিদার, কিন্তু দেশটা ছারখারে যাইতে দেখিতেছি। এই একা রায়-চৌধুরীতেই এই—না জানি আর একজন রায়চৌধুরী জুটিলে আরও কি না হইত ! অনাথ বলিল—ওটা উল্কাপাত ! ভূয়োদর্শনও অনর্থ উৎপাদন করে ইহা স্বীকৃত। গৌরাঙ্গ চৌধুরীও যে উল্কাপাত নয়—তাহার প্রমাণ কি ? উল্কাপাতের উপর উল্কাপাত হইলে ভীষণ অনর্থ উপস্থিত হইবে—ইহাও ভূয়োদর্শন। অনাথ বলিল—তবে তুমি গৌরাঙ্গ চৌধুরীর এ গ্রামে বাস ইচ্ছা কর না ? আমি বলিলাম—তাহাও বলিতে পারি না, পরীক্ষার মধ্যে রহিয়াছে। অনাথ বলিল—তবে তুমি কি চাও—আমাদের জন্মভূমি মালিগঞ্জ অধঃপাতে যাউক তাহাই চাও ? না, আমি তাহাও চাইনা। তবে কি চাও ? কি চাই তাহা বুঝিবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। মালি-গঞ্জ জন্মিয়াছে একদিন মরিবে ! গৌড় জন্মিয়াছিল—মরিয়াছে, রাজমহল

জন্মিয়াছিল—মরিয়াছে, মুরশিদাবাদ জন্মিয়াছিল—মরিয়াছে। এই নিয়ম যদি এই মালিগঞ্জে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে মালিগঞ্জ মরিবে! আমরা হাজার চেষ্টা করিয়াও বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব না—ইহাই ভূয়োদর্শন।

অনাথ বলিল—বেশ কথা; জমিদার ভগবানপ্রসাদ জন্মিয়াছে—মরিবে। তাহার অত্যাচার জন্মিয়াছে—মরিবে। তবে কেন তাহার উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ? তুমি কেন দৈবের উপর—পুরুষকারের উপর হাত দাও? তোমার অধিকার কি? তুমি নিয়তি মানিয়া চলিতে চাও তাই চল। নিয়তি ও অদৃষ্টের উপরে হস্তার্পণ করিবার প্রয়োজন? প্রয়োজন নাই কিন্তু প্রয়োজনও আছে—একথা তোমার বলা চলে না। তোমার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থের জন্য তুমি ব্যস্ত। হিংসা যেমন একটা বৃত্তি, তদ্রূপ আরও অনেক বৃত্তি আছে। ভগবানপ্রসাদ না হয় তোমার মত আরও কতকগুলি কুবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে—ইহাতে তোমাতে ও তাহাতে কিছুই প্রভেদ নাই। তুমিও যা ভগবানপ্রসাদও তাই, সদর নায়েবও তাই। হিংসা ও লোভ লইয়া, তুমি হিংসা ও লোভের সহিত সমর করিতেছ। উভয় পক্ষই অন্যায় করিতেছে। পাপীকে শাস্তি দিবার জন্য, তুমিও পাপ পথে চলিয়া পাপী হইতেছ। পাপে যেমন পুণ্য নাই, পুণ্যে যেমন পাপ নাই। তোমাতেও সেইরূপ পাপ আছে পুণ্য নাই—অসৎ আছে সৎ নাই! যদি পুণ্য থাকিত তাহা হইলে পাপ থাকিত না—সৎ থাকিলে অসৎ থাকিত না—কেমন?

আমি কিছু চিন্তিত হইলাম, পরে বলিলাম—তবে কি মার খাইয়া চুপ করিয়া থাকিব? ঘাতের ত প্রতিঘাত আছে?—আছে সত্য কিন্তু জমিদার যখন আঘাত করিয়াছে, তখনি তাহার হৃদয়ে প্রতিঘাতের সাড়া পড়িয়াছে। তাহা হইলে আমরা আর কিছুই করিব না, যা ইচ্ছা তাহাই

সে করিবে। আমরা স্থাণুবৎ উপভোগ করিব!—ব্যাপারটা তাই। তবেই বলিতেছি, খাঁটি কিছুই নাই সকলি মেকী—ভববানপ্রসাদও মেকী, আমরাও মেকী। ভগবানপ্রসাদ অসত্য আমরাও অসত্য। দ্বন্দ্ব বাধিলে এই হিসাবে বাধিবে। স্বার্থে স্বার্থে লড়াই বাধে, হিংসায় হিংসায় সমরানল প্রজ্বলিত হয়। সকলেই পূর্ণের দিকে চলিতে চায়—তোমার যখন অসম্পূর্ণ থাকিবে, তুমি তাহা পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিবে—এই চেষ্টার নামই দ্বন্দ্ব বা বিগ্রহ। তোমার হিংসার পূর্ণাহুতি হইলে তোমার দ্বন্দ্ব ভাব থাকিবে না, তুমি নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইবে। তদ্রূপ ভগবানপ্রসাদের আশক্তি ও কুপ্রবৃত্তির যে দিন পূর্ণাহুতি হইবে সেই দিন ভগবানপ্রসাদ আর থাকিবে না—দ্বন্দ্ব চেষ্টা সকলি পূর্ণতা নিবন্ধন শান্ত স্থির হইয়া যাইবে। ভূয়োদর্শন ইহাই বলে। এই হিসাবে আমি দার্শনিক বলিয়া তোমার নিকট আখ্যা পাইতে পারি। আমি অপূর্ণ—পূর্ণতার জন্য শক্তি অর্জ্জন করিতেছি; ভগবানপ্রসাদকে অপূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া আমি পূর্ণ হইব। অন্য কিছুতে নয়, প্রতিহিংসা চরিতার্থে। তাহা হইলে বল, তুমি মালিগঞ্জের উন্নতির জন্য কিছুই করিতে চাও না—দেশের জন্য কিছু করিতে চাও না। দেশটা, মালিগঞ্জটা অধঃপাতে যাউক, তাহাতে তোমার দৃক্‌পাত নাই—তুমি কেবল স্বার্থের দিকটাই দেখিতে পাইতেছ। আত্ম-তৃপ্তির জন্যই তুমি লালায়িত হইয়াছ। মুখে বলিতেছ—স্বদেশের উন্নতি বিধানার্থ চলিয়াছ—মাতৃভূমির সুখ শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্যই তোমার চেষ্টা, কিন্তু কার্য্যতঃ স্বদেশ-প্রেমের লেশমাত্র তোমাতে বিদ্যমান নাই! তুমি আত্মস্বার্থ চরিতার্থের জন্য অন্ধ হইয়াছ, মাতৃভূমির স্বার্থের প্রতি তোমার দৃষ্টি ও হৃদয় আদৌ আকৃষ্ট হয় নাই। সোজা কথায় বলিতে হইলে, তুমি দেখিতেছি স্বার্থবাগীশ হইয়া উঠিয়াছ! দেশমাতার প্রতি ভক্তি ও প্রেম প্রকাশ পাইতেছে না—তুমি মুখে যাহা বলিতেছ—হৃদয়ে

তাহা নাই! হয়ত ঐ দিকটাই তুমি মাতৃভূমির কল্যাণার্থ বলিয়া বুঝিতেছ, কিন্তু সেটা ভুল ধারণা। তোমাতে স্বদেশ-প্রীতি আদৌ নাই! প্রকারান্তরে স্বদেশ-দ্রোহী হইয়া পড়িতেছ—কেমন নয়?

তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে রাজপুতগণ দেশের জন্য কেন লড়াই করিল? অত্যাচারীর হস্ত হইতে দেশটাকে রক্ষা করিতে হইলে লড়াই করিতে হয়—মরিতে হয়। আমিও দেশের জন্য লড়াই করিব—মরিব। বেশ, তা যদি করিতে পার উত্তম—তুমি তাহা করিতেছ কৈ? তুমি যে স্বীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে ছুটিয়াছ! তাই তুমি সঙ্কীর্ণ পথে—পাপের পথে চলিয়া পাপী হইতেছ! দেশের জন্য, জননী জন্মভূমির জন্য, বিশ্বপ্রেমের উদয় তোমাতে হইয়াছে কৈ? রাজপুতগণ স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য, সমগ্র দেশবাসী, মাতা ভগ্নীর জন্য লড়াই করিয়াছিল। সকলের স্বার্থের মধ্যে তাহাদের স্বার্থ নিহিত ছিল, একার জন্য করে নাই! তুমি একার জন্য—নিজের জন্য—নিজের চিত্ত-প্রসাদের জন্য, এই অনুষ্ঠান করিয়া পাপের পথে, স্বার্থের পথে চলিয়াছ! তুমি কখনই স্বদেশ-প্রেমিক নও—যদি তাহা ভাব ভুল ভাবিতেছ! দেশের উপকার, দেশের সুখ, দেশের শান্তির জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে নাই—ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য তোমার হৃদয় নাচিতেছে। তুমি স্বদেশপ্রেমিক নও—স্বদেশদ্রোহী! ক্ষুদ্র হৃদয়—পাপী আখ্যা পাইবে। ইহাতে শান্তির লেশ মাত্র নাই! ভগবানপ্রসাদাধীকৃত জমিদারীস্থ জনগণের মঙ্গলার্থ বা আমাদের এই মালিগঞ্জের পূর্ণ হিতার্থে, যেদিন তোমার অভ্যুত্থান হইবে, সেইদিন তুমি স্বদেশপ্রেমিক পুণ্যবান্ বলিয়া গৌরববোধ করিতে সমর্থ হইবে, সে বিগ্রহে ও দ্বন্দ্বে আনন্দ পাইবে। নচেৎ আনন্দ নাই! যে দিন, পরের জন্য আপনাকে ভুলিবে সেইদিন তুমি খাঁটী হইবে'

অনাথের কথাগুলি, আমার প্রাণে মন্দ মন্দ আঘাত করিতেছিল কিন্তু আমার হৃদয়স্থ বিরাট স্পন্দনের সহিত স্পন্দিত হইয়া আত্মহারা হইয়া গেল। স্বতন্ত্রভাবে আমার প্রাণে অধিকক্ষণ সাড়া উৎপাদন করিতে পারিল না।

আকাশে মেঘ করিয়াছে—গুরুগম্ভীরনাদে মেঘের ডাক শ্রুতিগোচর হইতেছে। শন্ শন্ হন্ হন্ করিয়া বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। মালতীকুঞ্জে দুইখানি ঘর ছিল, আগন্তুকগণ তথায় অবস্থান করিত। গ্রামের জনগণ তাহাদের জন্য ভিক্ষা দিত। আজকাল সে প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে কোলাহল করিয়া একদল বৈষ্ণব, এই ঘর দুখানি অধিকার করিল। অনাথকে বলিলাম—এত লোক কি জন্য এখানে আসিল ? অনাথ আমার কথায় একটু হাস্য করিয়া বলিল—এরা রামকেলীর যাত্রী। বৈ. বৈষ্ণবীর দল—এদেশে এ প্রকার দলকে 'ন্যাড়ানেড়ীর' দলও বলে। এই ন্যাড়া নেড়ীর দলের অনেক রহস্য এদেশের মধ্যে প্রচলিত আছে। যাই হউক রামকেলী-মহোৎসব যে নিকটাগত তাহা বুঝিলাম, আমার একবার রামকেলী যাইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। অনাথকে বলিলাম—অনাথবন্ধু ! আমরাও কাল রামকেলীর যাত্রী হই এস। অনাথ বলিল—মন্দ কি ? কত দেশ বিদেশ হইতে পুণ্য মানসে, কতলোক এদেশে রামকেলী করিতে আসিতেছে, আর আমরা যাইতে পারিব না ? দেখ্‌বে গণেশ—সোনার গৌড়ের অবস্থা ! অমন সোনার গৌড়-নগর ধ্বংস হইয়াছে—কালের স্রোতে পাষাণ গলিয়া যায় ভাই !

আমরা মালতীকুঞ্জ হইতে গাত্রোত্থান করিলাম। বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর দল হট্টগোল আরম্ভ করিয়াছে। দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল, আমরা দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। অনাথ নিজের

গৃহে গেল, আমি বাড়ী আসিয়া বসিলাম। গভীর অন্ধকার, মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে চপলার ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল আলোক প্রকাশিত হইতেছে, বৃষ্টি এখন পূর্ণভাবে আরম্ভ হয় নাই। দুই চারি ফোঁটা করিয়া পড়িতেছে—সেই সময়ে আমার মাকে মনে পড়িল—মা যেন সেই কাঁচা মিঠা আম গাছের তলায়, আমার ছয় মাসের শিশু মূর্ত্তিটা ক্রোড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! সেই রাত্রের মত অন্ধকার! মা আমাকে কোলে করিয়া ঐ স্থানেই আশ্রয় লইয়াছিলেন! এই কথা হৃদয়-তন্ত্রিতে ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল—বক্ষের ভিতর হইতে একটা কম্পনবেগ উত্থিত হইয়া চকিতের ন্যায় সমগ্র শরীরে ছুটিয়া আমাকে অবশ করিয়া ফেলিল। পিতার নিকট শুনিয়াছি, আমাদের গৃহ তখনও দগ্ধ হইতেছিল! কে বা কাহারা, মাতৃক্রোড় হইতে সবলে আমাকে কাড়িয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক, মাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে দুষ্ট নর-পিশাচ দাওয়ানজী! তারপর আমার মায়ের পরিণাম কি হইয়াছে, তাহা অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। মা কি এখন জীবিত আছেন? পিতার নিকট শুনিয়াছি, এখনও জীবিত আছেন!

একাদশ পরিচ্ছেদ



মাতৃ-পূজা

"যদি ইচ্ছা হয়, দেব, আন বজ্রনাদ
প্রলয়-মুখর হিংস্র ঝটিকার সাথে।
পলে পলে বিদ্যুতের বক্র কষাঘাতে
সচকিত কর মোর দিক্ দিগন্তর!"

(রবীন্দ্র)

আমি ত আমার মায়ের মর্ম্ম অবগত নই। মা যে কেমন বস্তু তাহা ত চক্ষেও দেখি নাই! জ্ঞানপূর্ব্বক মাতৃস্পর্শও করি নাই! মাতৃস্নেহ কীদৃশ মহান্ তাহাও উপভোগ করিতে পারি নাই! অনাথের মা, অনাথকে কেমন ভালবাসে—আমিও অনাথের মাকে মা বলি। কিন্তু কৈ, ঠিক অনাথের মত ত আমাকে ভালবাসে না! নিজের মা, আর পরের মা—এক নয়! মা হইলেই যে, দেশের সকল ছেলে মেয়েকে ভালবাসিবে তাহা নয়! আমার মা, আমাকে যেমন ভালবাসেন, তেমন বুঝি আর কেহ কাহাকে ভালবাসে না! আমি যখন ছয় মাসের শিশু, তখন আমার মা আমাকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন—মা আমাকে মানুষ করেন নাই, আমিও সজ্ঞানে মায়ের স্নেহ, করুণা ও ভালবাসা পাই নাই—আমি মা চিনি না, মাও সন্তান চেনেন না! এস্থলে মাতৃস্নেহ কি থাকা সম্ভব? মা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন! আমারও

হয়ত মাকে দেখিয়া মায়ের মত ভক্তি হইবে না। মাকে হয় ত চিনিতেই পারিব না! পরের মায়ের মত মাকে ভাবিব। মাও হয় ত পরের ছেলের মত আমাকে ভাবিবেন। আমার মনে হয়, জন্মাবধি কোলে পিঠে করিয়া ছেলেকে মানুষ করিতে হয় বলিয়া ছেলে পোষমানিয়া যায়। মা ছোট হইতে পালন করেন বলিয়া—জন্তু পোষার মত এক মায়া জন্মিয়া যায়! অনেককে দেখিয়াছি পোষা বিড়াল মরিলে বিড়ালের শোকে আকুল হয়। মানুষ ছোট হইতে পোষ মানিয়া —মা বলিয়া ডাকে। পালনকর্ত্রীর স্নেহ হয়, মমতা হয়। পোষ্য-টীরও আশ্রয়স্থল বলিয়া মাতার পোষমানে, মাকে পালনকর্ত্রী বলিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করে। এই প্রকার স্নেহই হয় ত মাতৃস্নেহের অনুরূপ! আজন্ম লালনপালনই উভয়ের মধ্যে স্নেহের বিকাশ করিয়া দেয়। মাকে যদি আমি চিনিতে পারি, আর মা যদি আমাকে চিনিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিব, মাতৃস্নেহ বিধাতার এক অপূর্ব্ব দান! ইহার স্বরূপ মায়া বিশ্বে নাই! পরিচয় পাইয়া তবে চিনিতে পারিব। ছয় মাস হইতে উভয়ের মধ্যে দর্শনাভাব। মা তখন জ্ঞানবতী ছিলেন—আমি অজ্ঞান, হিতাহিত-বিবেচনা-রহিত জীব মাত্র ছিলাম। পরিচয়ান্তে যদি এখন মাতৃস্নেহ পাই—আমার হৃদয় মাতার স্নেহে দ্রবিভূত হইয়া পড়ে, তবেই বুঝিব মাতৃস্নেহ এক অপূর্ব্ব পদার্থ! আমার এক পরীক্ষা হইয়া যাইবে। যদি মাকে পাই, মাতৃস্নেহ পাই—তাহা হইলে মা কি মালিগঞ্জে আসি-বেন? যদিই আসেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি গিয়াছে বলিয়া, সমাজ তাঁহাকে সংসারে রাখিতে চাহিবে কেন? কি আশ্চর্য্য! আমার গর্ভধারিণী মাকে আমি গৃহে আনিয়া পূজা করিব—তাহা সমাজ দিবে না? এ জাতি-পাত, আমার মায়ের স্বেচ্ছায় সংঘটিত হয় নাই। এক্ষেত্রে তাঁহার অপরাধ কি? বিনা দোষে, সমাজ তাঁহাকে সমাজে প্রবেশাধিকার দিবে না!

সমাজ আমার মাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। দোষ সমাজের! তত্রাচ সমাজ, মায়ের উপর দোষ চাপাইবে—সমাজ নির্দ্দোষ থাকিবে। এ প্রকার সমাজের শাসন ভাল বোধ করি না। সমাজের শাসন সমষ্টিগত, শাসনসমষ্টির দুর্ব্বলতা, দোষ, পাপ—সমাজদেহে বিদ্যমান থাকে। সমাজকে অনুনয় বিনয় করিলেও ত আমার মাকে গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা দিবে না! আমিও ত সমাজের অঙ্গ—তবে কেন দিবে না? আমি সমাজে না থাকিলে সমাজ থাকিবে কিনা?—থাকিবে। একের অভাবে সমাজের সমাজত্ব যায় না। সমাজ অমর! সমাজের জরা বা মৃত্যু নাই দেখিতেছি, সমাজ চিরযৌবন। আমরাই সমাজের প্রাণ কিন্তু আমাদের দু দশ জনের অভাবে, সমাজের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সমাজ বুঝি একটা পদার্থ নহে! কেবল লোকের সমষ্টিটাই সমাজ নহে—লোক সংঘট্ট হইতে সমাজ একটা পৃথক জিনিষ নাকি?—যাহাই হউক, আমি যদি মাকে পাই তাহা হইলে গৃহে আনিব। সমাজের মুখ তাকাইয়া থাকিব না, তাহাতে যাহা হয় হইবে। মাকে পর করিয়া, আমি সমাজে কি করিয়া থাকিব! বাহির হইতে ডাকিল,—গণেশ। অনাথকে ডাকিলাম —আয়। অনাথ আসিল। তাহাকে বলিলাম,—অনাথ! যদি মাকে খুঁজিয়া পাই, তাহা হইলে যে কি করিব তাহা ত পিতা কিছুই বলেন নাই? না পাইলে তাঁহার শ্রাদ্ধের দিন, মায়ের শ্রাদ্ধ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। যদি পাই, তাহা হইলে কি করিব? বন্ধু কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, শেষে বলিলেন—সমাজে গোল বাধিবে, বিশেষ আমাদের "জাতীয়ারী পঞ্চাইৎ" যে প্রকার, তাহাতে তাঁহাকে গৃহে রাখা চলিবে না।—তাহা হইলে উপায়? উপায় আর কি—মালতীকুঞ্জের এক পাশে থাকিবেন। তাঁহাকে ঘরে রাখিলে তোমার জাতি যাইবে—সমাজ তোমাকে লইয়া চলিবে না—সমাজ তোমাকে আবর্জ্জনার মত ত্যাগ করিবে। আমার

মা ত ইচ্ছায় পতিতা হন নাই, সমাজ তাহা কি দেখিবে না ? সমাজ যদি বিচার না করে, তবে এমন অবিচারী সমাজের দরকার কি ? সমাজ হইতে বাহির হইয়া পড়িলে, সমাজ তাহাকে বাহিরেই রাখে—সমাজের ইহাই শাসন ! আমি বলিলাম এ শাসনটা যেন ভগবানপ্রসাদের শাসনের মত বোধ হইতেছে। সমাজের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি ? আচ্ছা দেখিব সমাজ কেমন।

উভয়ে এই প্রকার কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ ‘বাবাজী’ ও তিনজন ‘মাতাজী’ আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে “জয় রাধে কৃষ্ণ” বলিয়া প্রবেশ করিলেন। আমাদের দেশটা হরিভক্তের দেশ, আমি তাঁহাদিগকে বসিতে আসন দিলাম। বৃদ্ধ বাবাজী বলিলেন—তোমার নাম কি বাবা ? আমি বলিলাম ‘গণেশ’। তিনি বলিলেন—গণেশ, মালতীকুঞ্জের গৌরাঙ্গদাস কি জীবিত আছেন ?—আছেন। কোথায় থাকেন ? আমি বলিলাম—তিনি এখন রহমৎগঞ্জের নায়েব, রহমৎগঞ্জের ডিহিতে থাকেন। অনাথ বাবাজীকে বলিল—আপনি কি গৌরাঙ্গকে চেনেন্ ? বৃদ্ধ বলিল—চিনি বইকি, আমার পূর্ব্ব নিবাস এই মালিগঞ্জেই ছিল ; ঐ মালতী-কুঞ্জের দক্ষিণে যে বাঁশবন ও ডোবা দেখিতেছ, ঐ স্থানেই আমার ঘর ছিল, যে বাতাবীলেবুর গাছটা দেখিতেছ, ঐটা আমার শয়ন গৃহের পার্শ্বেই ছিল। আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল, আমি বলিলাম—দেশ ছাড়িয়া বৈরাগী হইয়া গেলেন কেন ? তাঁহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, তিনি অতি কষ্টে হৃদয়ের শোক চাপিয়া বলিলেন—সে অনেক কথা বাবা ! বলিয়া আর পূর্ব্বের শোক নূতন করিতে চাই না। এমন সময়ে অনাথের মা আমাদের বাড়ী আসিলেন এবং বৈষ্ণব দেখিয়া তিনি প্রণাম করিলেন। তিনজন মাতাজীর মধ্যে একজন তাঁহাকে বলিল—ঠাকুরঝি, আমাকে চিন্‌তে পার ? অনাথের মা কিছু আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া

তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন—ছোট বৌ! তোর চেহারা এমন হয়ে গিয়েছে? মাতাজী ছোট বৌ বলিলেন—আর চেহারা দিদি, যমে লয় নাই এই দুঃখ, আমার কি আর মুখ দেখাতে আছে! মালিগঞ্জের মায়া এখন ভুলিতে পারি নাই। তাই জন্মের শোধ একবার শ্বশুরের ভিটে দেখ্‌তে এলাম। অনাথের মা আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তোরা ছোট সাহজীর নাম শুনেছিস্—এই ছোট সাহজীর স্ত্রী। আমার হৃদ্‌পিণ্ড ধপ্ ধপ্ করিয়া সবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। আমার মা কি এর মধ্যে আছেন! এই ভাবনা হইল। বাবাজী অনাথের মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—কাকি, আমাকে চিন্‌তে পার্‌লে না? অনাথের মা বলিলেন—চিনেছি বাবা, তবে সাহস করে বল্‌তে পারিনি। তুমি আমাদের ভোলা, তুমি যে বেঁচে আছ তা আমি জানিতাম না। ভোলা বাবাজী বলিলেন—কাকি এই দেখ তোমার বৌ। কে? কামিনী! হায় হায় যে রাত্রে দাওয়ানজীর ডাকাতের দলে তোকে চুরি করে নিয়ে যায়, সেই দিন থেকে আর দেখিনি। যাক্ মা তুই যে ভোলার দেখা পেয়ে ভোলার কাছে আছিস্ এই সুখ মা; দাওয়ান ডাকাত মরেছে মা—মরেছে—আর তার ডাকাতের দলও মরেছে। রাধাশ্যাম আছেন, দর্পহারী হরি আছেন।

আমি ভাবিতেছি দুই জন মাতাজীর ত পরিচয় পাইলাম, তৃতীয়টীর ত পরিচয় কেহ দিল না। শুনেছি মা সুন্দরী ছিলেন। ভগবান! আমার মাকে দাও। হে দীননাথ, আমাকে মাতৃমুখ দেখাও প্রভু! আমার হৃদয়স্থ ভক্তি ঐ রমণীর চরণপ্রান্তে সংলগ্ন হইয়াছে, মাতৃভক্তি হৃদয়-মধ্যে নৃত্য করিতেছে। দেখিতেছি তিনি যেন আমার প্রতি মধ্যে মধ্যে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছে, লজ্জায় মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকার প্রতি মুখমণ্ডল অবনত করিতেছেন। কে যেন আমার

হৃদয়মধ্যে বলিতেছে—গণেশ, ঐ তোর হারাণ মা এসেছে প্রণাম করে পায়ের ধূলা নে। ভোলা বাবাজী বলিলেন—আর গোপনে প্রয়োজন নাই, কাকি ভাল করে দেখ দেখি—এ কে?—তিনি মুখ দেখান না। অনাথের মা, জোর করিয়া তাঁহার মুখ দেখিলেন এবং বলিলেন—গণেশ, তোর মা! আমি লাফাইয়া—জীবনের সাধ মা বলিয়া মায়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিলাম—মাতার স্পর্শে আমার দেহ পবিত্র হইয়া গেল, এক অপূর্ব্ব আনন্দে আমি জ্ঞানহারা হইবার মত হইলাম। মা আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—গণেশ, তুই আমার ছমাসের ছেলে এমন রে! তোর জন্যই এ পাপ জীবন এখনও রাখিয়াছি। ঐ কাঁচামিঠা আম গাছের তলায় আমার কোল থেকে তোকে টেনে ফেলে দিয়ে পাপিষ্ঠেরা আমার মুখে কাপড় জড়াইয়া, কাঁধে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দুষ্ট দাওয়ানজী নির্ব্বংশ হউক। আমার যেমন সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহারও তদ্রূপ সর্ব্বনাশ হউক।

ভোলা বাবাজী বলিলেন—এখন আমাদিগকে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে। এখনও আমাদের বিপদ কাটে নাই। আজ এই খানেই আহারাদি করিয়া কল্য সকলে রামকেলী যাই চল। পরে রাম-কেলী হইতে আসিয়া, গৌরাঙ্গ দাসের নিকট যাইব। তাহার পরামর্শ মত যাহা হয় করিব। অনাথের মাতাও ভোলা বাবাজীর সহিত রাম-কেলী যাইবেন স্থির করিলেন। আমি আমার মায়ের পা ধৌত করিয়া দিলাম, বাবা সেদিন যে ঘরে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে মাকে বসাইয়া আবার প্রণাম করিলাম—এতদিনে আমার হারাণ মাকে পাইয়া শান্তি বোধ করিলাম। মা আমার অবস্থা দেখিয়া পিতার জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

মা কি বস্তু—সন্তানের চক্ষে মা কীদৃশ অমৃতময়ী তাহা

অনুমান দ্বারা বুঝিবার উপায় নাই। সন্তানের জন্য মায়ের প্রাণ কেমন করে তাহা মা না হইলে অপরে বুঝিবে না। আমি মা দেখি নাই,—মা কেমন তাহাও বুঝি নাই। দেশের লোকের মা দেখিয়া, আমি মাতৃস্নেহের একটা কল্পনা করিয়াছিলাম; বর্ত্তমানে সেই কল্পনাটা হইতে একটা সুন্দর মাতৃস্নেহ বাহির হইয়া, আমাকে ক্ষুদ্র বালকের মত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বের কল্পিত ধারণা মুছিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে একটা সজীব উজ্জ্বল ধারণা দশদিক আলো করিয়া জ্বলিতেছে। আমার হৃদয়স্থ ভালবাসা শতগুণ পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। মাতৃমন্দির এতদিন শূন্য পড়িয়াছিল, সংসার শৃঙ্খলাবিহীন নীরস ভাব ধারণ করিয়াছিল। আজ আমার হারাণ মা মাতৃমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন—মাতৃপ্রতিমায় মন্দির উজ্জ্বল হইয়াছে। যে মা দেখে নাই, মায়ের ক্রোড়ে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হয় নাই, তাহার হৃদয় ঊষর হইয়া গিয়াছে, সে সংসারের একটা প্রেমে ও করুণায় চিরবঞ্চিত থাকিয়া গিয়াছে। সংসারে তাহার শিক্ষা দীক্ষা অসমাপ্ত রহিয়াই গিয়াছে। সে একটা সৌন্দর্য্য হইতে চিরবঞ্চিত রহিয়াছে। আমার হৃদয়ের একটা আধার এতকাল শূন্য পড়িয়াছিল, আজ পবিত্র ধারায় আধার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মা আজ অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে আমার মাতৃমন্দির আলো করিয়া দশহাতে অন্ন বিতরণ করিলেন। মা আমার নিজগৃহে ভিখারিণীর বেশে "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ



প্রতিহিংসা সাধন

"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি
রেখ রেখ মনে এ ধ্রুব জ্ঞান।
যাঁহার সলিলে মন্দাকিনী চলে
মলয়-অনিল সদা বহমান ॥"

পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হইয়াছে। ভোলাবাবাজী, মা ও আর দুইজন মাতার সঙ্গিনী আমার পরিবারভুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। এখন আমি সংসারী হইয়াছি। মা আমাকে সংসারী করিয়াছেন। সমাজ বড় উচ্চ-বাচ্য করিল না—কারণ তাঁহারা ভেখাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। মা, সাহজীদের ছোট বৌ এবং ভোলাবাবাজী ও তাঁহার স্ত্রীর জীবন কথা ও জমিদারের অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া হস্ত কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা অনুমান করিয়া লইবেন তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার কতদূর হইতে পারে। চার পাঁচ বৎসর দাওয়ানজী স্বীয় অধিকারে রাখিয়া, দিনাজপুরস্থ এক বাবাজীর আখড়ায় এই তিনটী রমণীকে দান করেন, এবং নিকটে তাঁহার ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির মধ্যে কয়েকজন লোক রাখিয়া দেন। তাহারা ঐ স্ত্রীলোক তিনটীর

প্রতি দৃষ্টি রাখিত; এবং পলায়ন করিয়া যাহাতে নিজের দেশে যাইতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত করিত। প্রথম প্রথম দুই তিন বৎসর, দাওয়ান নিজ বাসনা চরিতার্থের জন্য অপহৃতা রমণীগণের প্রতি বাঁদীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন; পরে তাঁহার আত্মীয় পুরুষগণের পরিচর্য্যার্থ নিযুক্ত করিতেন। আগন্তুক ভদ্র বা কোন সরকারী কর্ম্মচারী, কার্য্যব্যপদেশে দাওয়ান-জীর আবাসে আগমন করিলে, বিবিধ দ্রব্যসম্ভার ডালি দিতেন এবং তৎসহ নৈশ-সহচরীরূপে এই সকল অসহায়া রমণীদিগকে অর্পণ করিতেন। শুনা যায়, মালদহের কয়েকটা নীলকুঠীর মালিকও দাওয়ানকে এই প্রকারের অপহৃতা কয়েকটী রমণী দান করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। মা, ও এই দুই জনকে দিনাজপুরে বিতরণের জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কোন কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। মধ্যে মধ্যে তিনি কার্য্য-ব্যপদেশে দিনাজপুর যাইতেন, সেই সময়ে এই তিনটী নিরীহ প্রাণী তাঁহার ক্রীড়াসহচরী হইবে এই আশাতেই তথায় রাখিয়া আসেন কিন্তু আর তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হয় নাই। কর্ম্মচারীগণও বদলী হইয়া যায়, সুতরাং অত্যধিক অত্যাচারের হস্ত হইতে এই তিনটী রমণী অব্যাহতি লাভে সমর্থা হয়েন। তৎপরেই ভোলানাথ ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া, ইহাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে ভোলাবাবাজী এখন তথাকার আখড়ার প্রধান মহন্ত বলিয়া 'মান' পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমানে ইহাঁদের ইতিহাস এই পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিলাম। ভোলাবাবাজীর জীবনী সময়ান্তরে কিঞ্চিৎ বিবৃত হইবে।

বাড়ীর ভার, মা ও ভোলাবাবাজীর উপর ন্যস্ত করিয়া কয়েকদিবস হইল রহমৎগঞ্জে গৌরাঙ্গ চৌধুরীর নিকট আসিয়াছি। তাঁহাকে মা ও ভোলাবাবাজীদের কথা বলিয়াছি, তিনি বিশেষ কোন কথা বলেন নাই।

আমি তাঁহার অধীনে কার্য্য পাইয়াছি। আমি এক্ষণে ভগবানপ্রসাদ রায় চৌধুরীর বেতনভুক্ত কর্ম্মচারী। আর এই মনিব মহাশয়ই আমার পিতাকে জমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন! কালের কি বিচিত্র গতি! কূটনীতির কীদৃশ জটিলবর্ত্ম তাহাই চিন্তা করিতেছি। আমাকে যে কোন উপায়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে হইবে, মাতৃভূমির কলঙ্ক-কালিমা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। ভগবানপ্রসাদ দেখ! তোমার ভীষণ শত্রু তোমার ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছে। কেবল আমি নই—তুমি যে ব্রাহ্মণকে অপমানিত করিয়াছ—তাহাদের আত্মীয়, ভ্রাতা, পুত্র সকলেই তোমার গুপ্ত শত্রু! তোমার সর্ব্বনাশের জন্য তোমারই শরণাগত হইয়া অবস্থান করিতেছে। নন্দবংশ ধ্বংসের জন্য নব-চাণক্যের অভ্যুদয় হইয়াছে। তোমার ধ্বংস, ঐ দেখ সম্মুখে আগত প্রায়! সাবধান! এখন সতর্ক হও! কিন্তু তোমার সাধ্য কি তুমি তোমার গুপ্ত শত্রুগণকে চিনিতে পার! তাহাদের চক্রান্তে তুমি পদার্পণ করিয়াছ—তোমাকে আবর্ত্তিত হইতেই হইবে। তোমার রক্ষা নাই—ভবিষ্যতে তোমার বংশে বাতি দিতে কেহই থাকিবে না, তুমি ইহা দেখিয়া যাইবে। তোমার পোষ্যপুত্র—ঔরষজাত পুত্র নয়! এই প্রকার পোষ্য-গ্রহণপূর্ব্বক বংশ রক্ষা—ওটা লোক দেখান, মন বোঝা মাত্র কিন্তু তোমার বংশ ধ্বংস হইতেছে, তুমিই তোমার বংশের শেষ শিকড়মাত্র, কাল তোমাকে কর্ত্তন করিবে—তোমার বংশ লোপ হইবে।

ধুমধামের সহিত একটা দরিদ্রের পুত্রকে ভগবানপ্রসাদ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। দরিদ্র অর্থ লোলুপ না হইলে, কে এমন নিষ্ঠুর আছে যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রকে অপরকে দান করিতে পারে! যে মাতা পিতা আপন পুত্রকে টাকার লোভে বিক্রয় করিতে পারে—বুঝিতে হইবে তাঁহাদের হৃদয় কীদৃশ উপাদানে গঠিত। তাহারা স্বার্থপর, লোভী ও

নিষ্ঠুর, তাহাদের সমবায়ে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে—তাহাদেরও হৃদয় স্বার্থ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্যে ও মোহে পূর্ণ হইবারই কথা। দরিদ্রের পুত্র, ধনীর ঘরে আদৃত হইলে, তাহার হৃদয়—অতিসারে, অতিভোগে, বিকৃত হইবারই কথা। এ কথা যে মিথ্যা নয় তাহা ভগবানপ্রসাদের টাকা দিয়া কেনা ছেলেটাকে দেখিলেই বুঝা যাইবে। কেনা গোলাম পোষ্যপুত্র—নিজের জনক জননীর নিকট পর হইয়া গিয়াছে। পোষ্যপুত্রের মত জীব এদেশে আর দ্বিতীয় নাই। অধিকাংশ পোষ্যপুত্র অপদার্থ জীব। ভগবানপ্রসাদ পোষ্যটার সহিত তাহার পূর্ব্ব মাতাপিতা বা আত্মীয়-গণের দেখা সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পরের পিতাকে পিতা বলা যে কীদৃশ ঝকমারী তাহা পোষ্যবর্গই অবগত আছে। আপন মাকে পর করিয়া পরস্ত্রীকে মা বলিয়া কি সাধ মিটিতে পারে? হতভাগ্য পোষ্যটার দুঃখের কথা ভাবিয়া আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। আমি আমার হারাণ মাকে পাইয়া যে কত সুখী হইয়াছি তাহা আমি ভিন্ন আর কেহ অবগত নহে। হতভাগ্য পোষ্য, তাহার সেই আপন স্নেহময়ী মাতাকে হারাইয়া, তাঁহাকে পর করিয়া, সন্তান-স্নেহ-বিরহিতা অনৈকা রমণীকে মা বলিয়া সুখী!

পোষ্যগ্রহণ মাসাবধি হইয়া গিয়াছে। ভগবানপ্রসাদ রায়চৌধুরী বিশেষ কার্য্যবশতঃ জেলায় চলিয়াছেন, ষোলজন বেহারা ও আটজন ঢাল তলোয়ারধারী পাইক সঙ্গে চলিয়াছে। দুই চারিজন কর্ম্মচারী অগ্রেই গিয়াছেন। খাল বিল প্রান্তর দিয়া পাল্কী চলিয়াছে—বনভূমি মধ্য দিয়া পাল্কী চলিয়াছে। বেলা তৃতীয় প্রহরে "রাইগাঁ দীঘির" পশ্চিম পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া বেহারা ও পাইকগণ ছুটিয়াছে, জনমানবহীন বনভূমি ব্যাঘ্র, মহীষ প্রভৃতি ভীষণ জন্তুগণে পরিপূর্ণ। রাইগাঁ দীঘির মত প্রকাণ্ড দীঘি এতদঞ্চলে আর নাই বলিলেই হয়—মহারণ্যের মধ্যে

সুগভীর সুদীর্ঘ জলপূর্ণ দীঘি যেমন মনোহর তদ্রূপ ভীষণ। অনেক সময়ে এই দীঘির নিকট পথিকগণকে হত্যা করিয়া, দস্যুগণ সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক দীঘির জলে ফেলিয়া দিত। এ প্রবাদ এতদঞ্চলে শ্রুত হওয়া যায়। দীঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটী সুন্দর সুবৃহৎ দেবমন্দির—সে দেবমন্দিরের দ্বার ছিল না—কেবল ইষ্টকের পূর্ণগর্ভ মন্দিরের বাহিরে অসংখ্য অলিন্দ, তাহাতে কত দেব দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। বৎসরের মধ্যে বৈশাখ মাসে একবার পূজা হয়। সেই ইষ্টক স্তূপের পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ বট তরু, বিশাল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। ভীষণ রৌদ্র, ক্ষুৎপিপাসায় বাহক ও পাইকগণ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পাল্কীখানি বটছায়ায় রাখিয়া, তাহারা রাইগাঁ দীঘির মধ্যে গমন করিল, একজন পাইক মাত্র পাল্কীর নিকট রহিয়াছে। ভগবানপ্রসাদ নিদ্রিত—মৃদুমন্দ পবনে বটতরুছায়ার শীতলতায় রায়চৌধুরীর নিদ্রা গাঢ় হইয়া উঠিল। পাইকটা সুযোগ বুঝিয়া, আহারার্থে অপরাপর পাইক ও বেহারাগণের নিকট উপস্থিত হইয়া আহার করিতেছে।

আমার উপর যে কর্ত্তব্য-কার্য্যের ভার পড়িয়াছে, আমি তাহা সংসাধনার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছি। পাপ ও পুণ্যের বিভীষিকা ও চিরানন্দ আমার নিকট মিথ্যা অলীক বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই—অত্যাচারের প্রতিবিধান ও অত্যাচারীর আমূল উচ্ছেদে বাহুবল বুদ্ধি ও কূটনীতির প্রয়োজন। হরিণের ন্যায় ভীতুর কার্য্য নহে। নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস করিতে হইবে—মৃত্যুকে তুচ্ছ অলীক বোধে আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। দেখ, আমি আজ সেই পথে দাঁড়াইয়াছি—আমার ভয় নাই—আমার ভীষণ তরবারি কেমন ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। হৃদয়ের প্রতিহিংসা

তরবারির গাত্র হইতে ঝিক্ ঝিক্ করিয়া বাহির হইতেছে। অত্যাচারের প্রতিকারার্থে আজ আমি এই বনের মধ্যে অপেক্ষা করিতেছি; ঐ দেখ সঙ্গে পঞ্চাশটি সশস্ত্র বীরপুরুষ। গৌরাঙ্গ চৌধুরীর আমরা সাকরেদ্। মারিবার হুকুম নাই যখম করিবার হুকুম। কৃত্রিম দাড়ি, গোঁফ ও বাব্‌রী চুলের উপর লাল শালুকের পট্টি বাঁধিয়াছি, আমি সেই "গণ্‌শা" এখন ফরশা হাতে কার্ত্তিকের মত সেনাপতি হইয়া আসিয়াছি।

সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে—ধীরে ধীরে সকলে পাল্কীর নিকট গিয়া দেখি, কেহই নাই! অপূর্ব্ব সুযোগ, বিনা রক্তপাতে কার্য্যোদ্ধার হইল দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। সেই দুর্দ্দান্ত ভগবানপ্রসাদকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই টানিয়া পাল্কীর বাহিরে মাটিতে ফেলিলাম। চক্ষু মেলিতে না মেলিতে, চিৎকার না করিতে করিতেই মুখ, চোখ বাঁধিয়া চাপিয়া ধরা হইল—প্রহারের উপর প্রহার, চপেটাঘাতের উপর চপেটাঘাত—লাথির উপর লাথি—শেষে নাভীর উপর পা দিয়া চাপিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া হইল। প্রহারের ধমকে ভগবানপ্রসাদ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। নাসিকা দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। বুঝিলাম দিন কয়েক বাঁচিবে—কষ্টভোগ করিতে করিতে মরিবে। ইহার উপর বেশী প্রহার করিলে, এই রাইগাঁ দীঘির পার্শ্বেই মরিয়া পড়িয়া থাকিবে। ভগবানপ্রসাদ অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিল, আমরা প্রস্থান করিলাম।

আমি ন্যায় কি অন্যায় কার্য্য করিলাম, তাহার কৈফিয়ৎ কাহাকেও দিব না। আমি ভাল মন্দের—পাপ পুণ্যের, প্রশংসা ও নিন্দার জন্য ভাবি না, আমি এখন ভিন্ন প্রকৃতির হইয়াছি। কখন চুরি বা ডাকাতি করি নাই। এই দুষ্টকে নিগ্রহ ব্যতীত অপর কাহাকেও যে নিগ্রহ করি নাই তাহা নহে। কিন্তু দুষ্টকে শিক্ষা দিবার জন্য—পাপপথ হইতে তাহাকে ফিরাইবার জন্য আমি আমার হস্ত উত্তোলন করিয়াছি।

কেবল শান্তির অন্বেষণ করিলে, তুনিয়ায় শান্তি আসিবে না—এখন আর সেদিন নাই। কুকুরের মাথায় উপযুক্ত মুগুর মারিতে না পারিলে কুত্তা সায়েস্তা হইবে না। দেশের কুত্তাগুলাকে সায়েস্তা করিবার জন্য "গণ্শা" উন্মত্ত হইয়াছে। আমি চোর নই, ডাকাত নই, নরঘাতক নই।

ভগবানপ্রসাদের কি হইল ?—হইবে আর কি, সদরে যাওয়া হয় নাই, পর দিন এক প্রহর বেলা হইতে না হইতে ভগবানপ্রসাদের পাল্কী প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রকাশ ভগবানপ্রসাদ অসুস্থ হইয়াছেন। এ যে কীদৃশ অসুস্থতা, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। গৌরাঙ্গ চৌধুরী, অনন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় ভদ্র ব্যক্তি, ভগবানপ্রসাদকে দেখিতে গেলেন। উত্থানশক্তি রহিত—রক্তভেদ ও রক্তবমি হইতেছে। ভীষণ যন্ত্রণা—মনে হইল, বুকের পাঁজর তু এক খানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দিন কয়েকের মধ্যেই ভগবানপ্রসাদ ভীষণ রক্তভেদে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। দেশের লোকে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। নরকের কীট নরকে গমন করিল—পল্লীতে পল্লীতে প্রকৃতিপুঞ্জের মুখমণ্ডল ফুল্ল হইয়া উঠিল। "হরি হরি বল হরি বোল" ধ্বনিসহ ভগবানপ্রসাদের শববাহকগণ, শব স্কন্ধে করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিল। ভগবানপ্রসাদ! তোমার আত্মা এখন বুঝিতেছে—কে তোমার দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়াছে—যদি আত্মা থাকে তবে বুঝিবেই নিশ্চয়! প্রতিহিংসার সাফল্যে আমার হৃদয় আনন্দিত হইয়াছে। দেশের লোকেরও আনন্দ! অধিক দিন জীবিত থাকিলে আরও অধিক পাপভারে ক্লান্ত হইত। মৃত্যু তোমার মঙ্গল বিধান করিল! তোমার মৃত্যুতে দেশ ফুল্ল হইয়া উঠিল—তুমি পাপী নারকী, যাও নরকে।

মৃত্যুর পরদিন কে বা কাহারা রাষ্ট্র করিল—নাবালকের ষ্টেট গবর্ণ-

মেণ্ট দেখিবেন—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর আসিতেছেন—সমস্ত সম্পত্তি "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে" যাইবে। রাজবাটীর মধ্যে বিশেষ রমণী মহলে অত্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইল। নগদ টাকা, মোহর, স্বর্ণ, রৌপ্য সমুদয় লুট হইবে। ভগবানপ্রসাদের মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে, সাদৎআলী মিঞা নামক একজন সম্ভ্রান্ত আয়মাদারের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল এবং তাহার বিষয় সম্পত্তি জোর করিয়া অধিকার করিয়াছিল। তাহাদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ লুট করিবে, এখন আর ভগবানপ্রসাদের ভয় নাই। অপুত্রক মিঞার সম্পত্তি যদ্রূপ লইয়াছে, যদ্রূপ আত্মসাৎ করিয়াছে —ভগবানপ্রসাদের ত্যক্ত সম্পত্তিও তদ্রূপ হইবে।

গৌরাঙ্গ চৌধুরীর চক্রান্তে অনন্ত মুখোপাধ্যায়, জমিদার পত্নীর হিতকল্পে গোপনে তাঁহাকে কি পরামর্শ দিলেন। রাত্রে, গোপনে গাড়ী বোঝাই টাকার তোড়া—খিড়কী দ্বার দিয়া কোথায় চলিয়া গেল। তৎপর দিবস রাত্রেও স্বর্ণ, রৌপ্য, মোহর এবং নগদ টাকা গৌরাঙ্গচৌধুরী ও অনন্ত মুখোপাধ্যায়ের হেপাজতে জমিদারের মালখানা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিশ্বাসী সদর নায়েব, অনেকগুলি টাকার তোড়া আত্মসাৎ করিলেন। জমিদার পত্নী—ঝি, আত্মীয় ও আত্মীয়ের দাস দাসীর জিম্মায় অনেক টাকা কালিকাপুরের কর্ম্মচারীগণের নিকট পাঠাইলেন—তাহার কতক নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইল—কতক পথিমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পথে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। অধর্ম্মার্জ্জিত লুটের টাকা লুট হইয়া গেল। সপ্তাহকাল এই প্রকার গোপনে জমিদারের টাকা হরিরলুট হইল। তৎপরে সদর নাজির আসিয়া মালখানায় কুলুপ দিলেন—ধীরে ধীরে—মালের তালিকা হইল—তালিকা কালেই অনেক মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তি কোথায় অদৃশ্য হইল।

দেওয়ানজী ও ভগবানপ্রসাদের প্রেতাত্মা, প্রেতমূর্ত্তিতে অন্দরের মধ্যে

ঘুরিতেছে ; অধর্ম্মার্জ্জিত অর্থরাশি চৈত্রের শিমুল তুলার ন্যায় উড়িয়া চতুর্দ্দিকে ছিটাইয়া পড়িতেছে। প্রেতাত্মাগণ তাহা দেখিতেছে। নাবালক কেনাগোলাম কিছুই বুঝিল না—দিন কয়েকের মধ্যে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের নিযুক্ত ম্যানেজার মিঃ বেলী সাহেব আসিয়া সমস্ত সম্পত্তি বুঝিয়া লইলেন। জমিদারীর কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইল। মাস দুইয়ের মধ্যে সদর নায়েব কার্য্য হইতে বরখাস্ত হইলেন। অনন্ত মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ চৌধুরী ও আমি ষ্টেটের সদর কাছারিতে কার্য্য পাইলাম। গৌরাঙ্গচৌধুরী সদর নায়েব হইলেন। একদিন অবসর প্রাপ্ত সদর নায়েবের মাথা কে বা কাহারা ফাটাইয়া দিয়াছে। রাষ্ট্র হইল, ঘোড়া হইতে পড়িয়া তাহার এই শোচনীয় দুর্দ্দশা হইয়াছে। পাপিষ্ঠ দুর্ম্মুখ, সপ্তাহকাল শয্যায় ছটফট্ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিল। একদিকে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, অপর দিকে ষড়যন্ত্রীদের দল উপস্থিত কূটনীতি ত্যাগ করিয়া, দেশের হিতসাধনায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইল।

কি প্রকারে প্রজাপালন করিতে হয়, কি প্রকারে দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, এবং কোন অভিনব সৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের সুপন্থা আবিষ্কার করিতে হয়, তাহা ভগবানপ্রসাদ অবগত ছিল না। মিঃ বেলী, তাহা দেশের জমিদারবর্গকে শিক্ষা দিলেন। শ্বেতকায় ইংরাজ যুবক মিঃ বেলী, জমিদারীর আয় বৃদ্ধির যে সুন্দর ব্যবস্থা করিলেন তাহা দেশের পক্ষে অতি মঙ্গলপ্রদ হইল।

ম্যানেজার সাহেবের সুনাম, আজিও দেশের নরনারীগণ ভক্তিসহকারে উচ্চারণ করিয়া থাকে। জমিদারী মধ্যে ভীষণ বন ছিল, সেই বনে ব্যাঘ্র, বন্য মহিষ ইত্যাদির যৎপরোনাস্তি উৎপাত ছিল, বৎসরে বৎসরে কত শত প্রজার জীবন বিপন্ন হইত। দয়ালু বেলী সাহেব, একে একে বনভূমি পরিষ্কার করিয়া পল্লীপ্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলেন—প্রচুর

উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হইল, নিরন্ন নির্ধন প্রজাগণ সেই উর্ব্বর ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া, দারিদ্র্যতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে আরম্ভ করিল—হিংস্র জন্তুর ভয় অপসারিত হইল। প্রায় পঞ্চাশটা পল্লী প্রতিষ্ঠিত হইল। সুপথের অভাব ছিল, সুন্দর সরাণ নির্ম্মিত হইল—পচা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া দেশের জলকষ্ট নিবারণ করিলেন। ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই পুণ্য সময়ে, দোফসলী জমির খাজনা চারি আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত প্রতি বিঘায় ধার্য্য হইয়াছিল। এক ফসলী জমির মধ্যে ভাল মন্দ বিবেচনায় দুই আনা হইতে তিন আনা নির্দ্দিষ্ট হইল। 'বাস্তুর' খাজনা বিঘা প্রতি এক টাকা এবং 'উদ্‌বাস্তুর' রাজস্ব আট আনা ধার্য্য ছিল। কোন প্রকার উৎপীড়ন, অত্যাচার কিছুই ছিল না, কোন প্রকার বাব্ বা মাঙ্গন ছিল না বলিলেই হয়। দেশটা রামরাজ্যে পরিণত হইল। জমিদারীর আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হইল। সেই বেলী সাহেবের সময়ের একটা সুন্দর পাদপশ্রেণী-সজ্জিত সুপথ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। বেলী, তুমি অমর হও। ভগবানপ্রসাদ তুমি নরকে যাও। বেলী সাহেবের সুনামে সমগ্র জমিদারী মুখরিত হইয়া উঠিল—তিনি যথায় অবস্থান করিতেন তথায় একটী সুন্দর বাংলো ছিল—তাহার সম্মুখে পুষ্পোদ্যান ও কমলা-লেবুর উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—অদ্যাপি তাঁহার সাধের কমলা-বৃক্ষগুলি মৃতবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জমিদারীর আয় বৃদ্ধি হইল—প্রজাগণ শান্ত শিষ্ট ও জমিদারভক্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে নাবালক সাবালক হইয়া বিষয় সম্পত্তি বুঝিয়া লইলেন—নূতন ম্যানেজার নিযুক্ত হইল এবং পূর্ব্বকার সদর নায়েবের পদটী ম্যানেজারের পদে পরিবর্ত্তিত হইল। বেলী সাহেব, দেশবাসীর ভক্তি ও বিদায়কালের নয়নাশ্রু লইয়া কটকে চলিয়া গেলেন। পোষ্যপুত্রের হস্তে জমিদারীর ভার পড়িল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ



নূতন ম্যানেজারের কীর্ত্তি

"ঘুচ ঘুচ মহাপাপি! বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্মায় লোকেতে ॥
পরম-ধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ।
সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ ॥"

(চৈঃ ভাঃ)

বর্ত্তমানে যিনি ম্যানেজার হইয়াছেন তিনি একজন বি, এ; বি, এল—উকিল। সাঁওতাল পরগণার রাজমহল-আদালতে অনেক দিন ওকালতী করিয়া পয়সা কিছু করিয়াছেন। সত্যপ্রিয় অসভ্য বর্ব্বর-গুলার ওকালতী—"দুমুখো রোজগার"—করিয়া স্বভাবটার পরকাল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। শোনা যায়, শেষে সাঁওতালগণ তাঁহার উপর চটিয়া "কাঁড় বিধাঁই দিব" বলায় রাজমহল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে লক্ষ্মীদেবী তাহার স্কন্ধে ভর করিয়া বসেন। দৈব বিড়ম্বনায় তিনি ষ্টেটের ম্যানেজার হইলেন। প্রজাগণ ভাবিল বেলী সাহেবের মত না হউক—অন্ততঃ দুষ্ট হইবে না। প্রথম, "মুখ-পাত"টা ভাল দেখা যায়—নূতন ম্যানেজার জাতিতে ব্রাহ্মণ—চেহারাটা

'পাকাটে' গোছের—দেখিলেই মনে হয় দুষ্টামিতে পূর্ণ। প্রথম প্রথম ষ্টেটের কর্ম্মচারীগণের উপর যথেষ্ট "তাইশ" আরম্ভ হইল। নূতন নূতন রুলজারি হইতে আরম্ভ হইল এবং কথায় কথায় 'নোটিশ' জারি হইতে লাগিল। কর্ম্মচারীগণ ভিতরে ভিতরে চটিয়া লাল হইয়া উঠিল। তহশীলদার, নায়েব, আমিন প্রভৃতির উপর কড়া কড়া হুকুম চলিতে লাগিল, খাজনা আদায়ের 'জোর-তলব' প্রচারিত হইল। জমিদার বুঝিলেন, এ ম্যানেজার কাজের লোক। উকিলী ফের প্যাঁচ লইয়া তিনি নিয়ত কাজ কর্ম্ম করেন—আইন কানুন তাঁর কণ্ঠস্থ—মফঃস্বলের ডিহীর কার্য্যপ্রণালী দেখিবার জন্য তিনি "ইনেসপেক্টর" রূপ নূতন পদের সৃষ্টি করিলেন, এই ব্যপদেশে তাঁহার দুই চারী জন আত্মীয় কর্ম্মপ্রাপ্ত হইল, প্রজাগণ প্রথম ছয় মাস, সুযোগ্য ম্যানেজার বাহাদুরের প্রশংসা করিল; কারণ তখন তাহারা ম্যানেজারের মহৎ গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হয় নাই। উপরি-পাওনার প্রতি ম্যানেজার মহাশয়ের তীব্র দৃষ্টি পতিত হইল, মনে করিলেন ম্যানেজারী করিয়া বেশ দশ টাকা উপায় করিয়া লইবেন; ভিতরে ভিতরে 'জলকরের' বন্দোবস্ত-ব্যপদেশে মোটা টাকা আত্মসাৎ করিলেন। পুরাতন 'মহলদারগণ' প্রথমেই বুঝিতে পারিল—ম্যানেজার পুঙ্গব কেমন লোক! বেলী সাহেবের সময় জমিজমার "নিরিখ" যে হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহা দরিদ্র প্রজার উপযুক্ত হইয়াছিল—এক ফসলী চারি আনা, দোফসলী ছয় আনা—বাস্তু এক টাকা, বাগীচা আট আনা বিঘা প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

নূতন ম্যানেজার, আমিন পাঠাইয়া দরিদ্র পল্লীর দরিদ্র প্রজার জমি জরিপ করিয়া জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেন। বাড়্তি জমির দশ বৎসরের বাকী খাজনা, সুদ সমেত আদায় করিবার হুকুম হইল। জমির খাজনার হার চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল। নূতন কবুলতী দিবার নিয়ম প্রচারিত

হইল, পাট্টা দিবার প্রথা উঠাইয়া দিলেন। প্রত্যেক রকম ফসলের জন্য পৃথক্ পৃথক্ খাজনার হার স্থির হইল—ধানের জমিতে কলাগাছ রোপণ করিলে বিঘা প্রতি চারি টাকা খাজনা দিতে হইবে, বাগবাগীচা করিলে বিঘা প্রতি আট টাকা দিতে হইবে; এই প্রকারে আউস জমিতে বেগুন দিলে খাজনা বৃদ্ধি হইবে। তরি তরকারির খাজনার হার খুব চড়া হইল। বাস্তবাটীর খাজনার হার, গৃহ হিসাবে—গৃহের প্রাকার হিসাবে বৃদ্ধি হইল। যে প্রজার খড়ের ঘরে বেড়া দেওয়া আছে অর্থাৎ মাটির দেওয়াল নাই তাহার খাজনা দুই টাকা—অবশ্য একখানি বড় ও একখানি ছোট ঘর থাকিবে। নূতন চালা ঘর তুলিলে তৎক্ষণাৎ অধিক খাজনা দিতে হইবে, দেওয়ালী ঘর তুলিলে—বাস্তজমির খাজনার উপর ঘর প্রতি চারি টাকা অধিক কর দিতে হইবে। ইষ্টক দিয়া রোয়াক বাঁধাইলে বা সিঁড়ী বাঁধাইলে, সেই গৃহের খাজনা দুই টাকা বৃদ্ধি হইবে। ইষ্টক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে, বাস্তভিটায় খাজনার উপর প্রতি "কুঠরী" বা কামরার জন্য আট টাকা অতিরিক্ত দিতে হইবে। খাল খন্দক বা পুষ্করিণী খননের অধিকার প্রজার নাই। আবশ্যক হইলে জমিদারের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। হস্তরোপিত বৃক্ষ প্রজা কর্ত্তন করিতে পারিবে না, জমিদারকে এতলা দিতে হইবে—বৃক্ষের "বেড়" মাপিয়া প্রতি হাতে দুই টাকা মূল্য ধার্য্য করিয়া জমিদার অগ্রে চৌথ আদায় করিবেন—তৎপরে বৃক্ষ কর্ত্তনের অনুমতি দিবেন। জমিদারের নিকট যে কোন দরখাস্ত করিতে হইলে, প্রতি দরখাস্তে এক টাকা জমিদারের নজরানা দিতে হইবে, আমলাগণ বাবতে দুই টাকা দিতে হইবে, তদুপরি আটপ্রহরী, পেয়াদা প্রভৃতিকে কিছু কিছু স্বতন্ত্র-ভাবে দিতে হইবে। পূর্ব্বে যে সকল বাব্ ছিল, তাহার উপর চারিটী অতিরিক্ত বাব্ দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। এই প্রকারে বর্নকর,

ঘাসকর, জলকর, ফলকর, মহুলীয়া (মধু সংগ্রাহক) কর, প্রভৃতি বহুবিধ কর প্রবর্ত্তিত হইল। প্রজার অর্থশোষণের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া নূতন ম্যানেজার, যুবক জমিদার রায়চৌধুরীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ম্যানেজারের খোস্‌নাম প্রজামণ্ডলীর মুখে মুখে গীত হইতে লাগিল। প্রজাগণ —"নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইল, ইহাকেই বলে "রামরাজত্ব"। পোষ্যপুত্রের রাজত্বকালে প্রজাগণ চক্ষে অন্ধকার দেখিতে আরম্ভ করিল। মূর্খ, চঞ্চলপ্রকৃতি, সন্দিগ্ধমনা পোষ্য জমিদার এত বড় একটা ষ্টেটের মালিক হইয়া ধরাকে সরার মত জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলেন। জমিদার মূর্খ, ভীরু অথচ খামখেয়ালী গোছের লোক। বিশ্বাস বলিয়া পৃথিবীতে যাহা আছে—এই কলমের চারা রায়চৌধুরীতে তাহা নাই। দুনিয়াখানাকে তিনি অবিশ্বাসের চক্ষে দেখেন। সাবালক হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, একটি কন্যারত্ন গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে। তিনি তাঁহার শ্বশুরালয় হইতে দুইটি বন্ধু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। বন্ধুদ্বয়ের একটি কালিকাপুরের অনন্ত মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র অমরেন্দ্র এবং অপরটি তাঁহার পিস্‌তুতো ভাই কবিরাজ ব্রজেন্দ্রগোপালের জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়গোপাল।

ম্যানেজার বাহাদুর প্রায়ই মফঃস্বলে গমন করেন, গমন সময়ে ষ্টেটের হাতীর উপর "তানজাম্‌" স্থাপন করিয়া তদুপরি তিনি অবস্থান করেন। মফঃস্বলের নায়েব, গমস্তা, মণ্ডল ও প্রজাগণ তাঁহার সন্তোষবিধানার্থ নজরানা দেয়। ইহা এক প্রকার মন্দ নয়—যথেষ্ট আয় হইতেছে। তদুপরি জমি জমা লইয়া গোলযোগ ত বাধিয়াই আছে, তাহার মীমাংসা কল্পে দশ টাকা বাজে উপায়ও হয়। জমিদারের নজরানা সকল বিষয়ে এক টাকা ষ্টেটে অর্পণ করিয়া—"সিংহ অংশ"টা ম্যানেজার গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অর্থ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে হারহারী ভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। প্রজার গলায় পা দিয়া যাহা আদায়

করা হয়, তাহা সাতভূতে বাঁটিয়া খায়। "মুরগীর জান যায়—খানেবালার পেট ভরে না" প্রজার পক্ষে তাহাই হইল। গাছকাটা, ফলপাড়া, মাছধরা, ঘাসকাটা, সরকারী খাসখামারে গরু চরাণ বাবতে জরিমানা আদায় হয়—তাহার হিসাব ষ্টেটের ভাণ্ডারে পৌছায় না—বাহিরে বাহিরে সাত ভূতে খাইয়া ফেলে। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, দ্বিরাগমন ব্যপদেশে জমিদারের নজরানা আছে, তাহার কিঞ্চিৎ জমিদারী-কোষাগারে হাজির হয় মাত্র। এই সমস্ত বাদে, প্রজার নিকট যে কত বাবতে কত আদায় করা হয়, তাহা প্রজারাই বলিতে পারে; তাহার হিসাব দিবার প্রয়োজন দেখি না। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি মূলে অনেক টাকা ম্যানেজারের সিন্দুকে জমা হয়। শ্রীমান গণেশচন্দ্র দাস এ সকলের হিসাব স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। গৌরাঙ্গ চৌধুরী বর্ত্তমানে ম্যানেজারের বড় প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। আমি যে গণশা, সেও ম্যানেজারের নেক নজরে পড়িয়াছি! আমরা দূরে দূরে অবস্থান করি, ম্যানেজারের হুকুম ষোল আনা তামিল না করিলেও—তাঁহার নেক নজর হইতে বঞ্চিত হই না। ইহার একটা মুখ্য কারণ আছে, সেই মুখ্য কারণটীর গুপ্তরহস্য সংক্ষেপে এই স্থানে ব্যক্ত করিব।—আমাদের মধ্যে কুমৎলব আছে,—আমরা একটা চক্রান্ত করিলাম,—আমাদের বশীভূত বিশ্বাসী একদল মোসলমান প্রজা—এতদঞ্চলে বড়ই দুর্দ্দান্ত প্রজা বলিয়া খ্যাত—তাহাদিগকে লইয়া আমরা একটা দল বাঁধিয়াছি; তথায় ম্যানেজারের হুকুম বড় তামিল হয় না। হিম্মৎ আলী সেই মহলের মণ্ডল, তাহার নামে "বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়"! হিম্মৎআলী আমাদের দক্ষিণ হস্ত ও পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি, সেই অঞ্চলের তহশীলদার আমি; হিম্মৎ আলীর খানকা গৃহে আমার কাছারী বসে। আমাকে হিম্মৎ বড়ই ভালবাসে। গৌরাঙ্গ চৌধুরী সেই মহলের নায়েব, আমি তাঁহার আজ্ঞাকারী ভৃত্য।

আমাদের চক্রান্তের মধ্যে অমরেন্দ্র কবিরাজ ও বিজয়গোপাল আছেন; তাঁহারা তাঁহাদের অপমানের প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া জমিদার-বন্ধুরূপে বিরাজ করিতেছেন। রামগোপাল ও সাধু ভজহরির পুত্র রামহরি জমিদারী ষ্টেটের সদর খাজাঞ্চি ও ক্যাশিয়ার হইয়াছেন। এ সকল গুপ্ত কথা ম্যানেজার বা জমিদার রায়চৌধুরী অবগত নহেন। এতদ্ব্যতীত কালিকা-পুরের একজন দুমুখো বিদূষক ধরণের লোক, জমিদার কাছারীর পল্লী-গোয়েন্দারূপে অবস্থান করিতেছেন, এই সকল ব্যক্তি জমিদারের প্রচ্ছন্ন শত্রু হইয়াও পরম মিত্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। আমাদের দলে মন্ত্রগুপ্তীর শক্তি অপরিসীম। আমাদের চরম উদ্দেশ্য—জমিদার রায় চৌধুরীর হিতাকাঙ্ক্ষীগণকে—ষ্টেট হইতে বিতাড়িত করা এবং শত্রুর দল পুষ্ট করা। জমিদারের হৃদয়ে অশান্তি বৃদ্ধি করা, জমিদারের অর্থের সংব্যবহার করা, শেষে জমিদারের সর্ব্বনাশ করা। যাহাই হউক আমাদের চক্রান্তে পড়িয়া আইনজ্ঞ ম্যানেজার বাহাদুর, আমার এলাকায় আসিয়া তাঁবু ফেলিলেন। আমাদের বিশ্বাসী লোক সদরে চাকরী করে, আট প্রহরী হইতে রক্ষকগণও আমাদের দলের লোক, ম্যানেজার তাহা অবগত নহেন। ম্যানেজার আসিয়াছেন—মণ্ডলের তলব হইল, মণ্ডল প্রজাগণকে ডাকিয়া ম্যানেজারের নিকট হাজির করিল, তাহারা তাঁহার নিকট বড় শিষ্ট শান্ত এই ভাব দেখাইয়া 'নজরানা' দিল। ম্যানেজার বাহাদুর রায়চৌধুরী জমিদার মহাশয়কে পত্রদ্বারা জ্ঞাত করাইলেন যে, এস্থানের প্রজাগণ তাঁহার আগমনে শাসিত হইয়াছে, প্রজারা বড় সৎ লোক।

দুদিন চারি দিন অতিবাহিত হইল—ম্যানেজার যাহা বলেন প্রজারা তাহাই অম্লানবদনে স্বীকার করে। গৌরাঙ্গ চৌধুরী ম্যানেজারের নিকট "সাবাস" পাইলেন। কল্য ম্যানেজার সদরে প্রত্যাগমন করিবেন, রাত্রে

এক কাণ্ড হইয়া গেল—কে বা কাহারা ম্যানেজার সাহেবের তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিয়াছে, টাকাকড়ি লুটিয়া লইয়াছে। প্রহারের মাত্রাটা অতিরিক্ত হইয়াছে, ম্যানেজার অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। প্রাতঃকালে গৌরাঙ্গ চৌধুরীর নিকট এই সমাচার পৌছাইল। ম্যানেজারের তাঁবুটী গ্রামের বাহিরে আমবাগানের মধ্যে ছিল, আমরা তথায় গিয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিলাম। একজন লোকও তথায় গমন করে নাই, ম্যানেজারের মুখমণ্ডল স্ফীত হইয়াছে, উত্থানশক্তি রহিত। শয্যায় মদ্যের দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে—শান্‌কীতে অর্দ্ধভুক্ত মাংস রহিয়াছে। প্রহরীদ্বয়ের হস্তপদ বন্ধন করিয়া কে আমগাছে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; তাহারা বলিল ম্যানেজার বাহাদুরকে মোসলমানগণ মাংস খাওয়াইয়া দিয়া জাতি নষ্ট করিয়াছে, এতদ্ব্যতীত আরও দুর্নাম করিল। গৌরাঙ্গ চৌধুরী, এ সকল কথা একেবারে গোপন করিয়া ফেলিলেন। ম্যানেজার সাহেব, এইরূপ "পেঁয়াজ পয়জার" খাইয়া আমাদের নিকট শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছেন; পাছে আমরা এই সকল কথা রাষ্ট্র করিয়া দিই সেইজন্য তিনি আমাদের বশীভূত হইয়া গিয়াছেন। তিনি তথায় দুই দিবস অবস্থান করিয়া, আমাদের শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করিয়া রিক্তহস্তে সদরে গমন করিলেন। যে সকল প্রজা নজরানা দিয়াছিল তাহারা উহা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া—হাস্য করিতে আরম্ভ করিল। ম্যানেজার যখন হাতীতে আরোহণ পূর্ব্বক সদরে গমন করেন সেই সময়ে প্রজাগণ আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিতে ভুলে নাই। মূলতঃ কোন মোসলমান তাঁহার উপর অত্যাচার করে নাই। আমরাই কয়েকজনে মোসলমান সাজিয়া এই কাজ করিয়াছিলাম। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিজহস্তে পাঁঠার মাংস খাওয়াইয়া ছিল। তাঁহার পোষাক ও কথাবার্ত্তা ঠিক মোসলমানের মত হইয়াছিল। যে দুই জন আমগাছে বাঁধা ছিল,

তাহারাও আমাদের লোক, এই উপায়ে বি, এ, বি, এল; বিজ্ঞ ম্যানেজার পুঙ্গবকে আমরা দোরস্ত করিয়া দিয়াছিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নূতন বন্দোবস্ত

"উজীর হল রায়জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল অরি।
মাপে কোণে দিয়ে দড়া, পোনের কাঠায় কুড়া,
নাহি মানে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হৈল কাল, খিলভূমি লিখে মাল,
বিনা উপকারে খায় খতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥
ডিহিদার অবোধ খোজ, টাকাদিলে নাহি রোজ,
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
* * *
পেয়াদা সভার নাছে, প্রজারা পলায় পাছে,
দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা।
প্রজারা ব্যাকুল চিত্ত, বেচে ধান্য গরু নিত্য,
টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা ॥"

(কবিকঙ্কণ)

কোদালীয়া বাথানের জমিদারীর মধ্যে 'নূতন বন্দোবস্ত' হইবে, এই কথা যেখানে সেখানে শুনিতে পাইতেছি। ম্যানেজার মহাশয় নাকি 'আদা-

জল' খাইয়া প্রজাদের সর্ব্বনাশের জন্য, জমিদারীর আয় বৃদ্ধির জন্য নূতন বন্দোবস্ত করিবেন। তিনি বলিলেন—প্রজা শালারা বহুৎ সরকারী জমি জমা গোপনে ভোগ দখল করিতেছে, পাঁচ বিঘা জমির বন্দোবস্ত লইয়া, দশবিঘা জমি দখল করিতেছে। এই জমিদারী ষ্টেটের মধ্যে যে সকল কর্ম্মচারী আছে—তারা গাধা, প্রজাদিগকে শাসনে রাখিতে জানে না। প্রজাগুলা, জমির দশআনা উপস্বত্ব জমিদারকে যদি না দিল—তবে আর দিল কি! যেমন করিয়াই হউক, প্রজার বার আনা ফসল গ্রহণ করিতেই হইবে। পূর্ব্বে যারা ম্যানেজার ছিল, তারা এক একটী বাঁদর! এত কম নিরিখে জমি জমা বিলি করিয়া গিয়াছে যে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তারা জমিদারী-সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের কোন কিছুই জানিত না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বন্দোবস্তের দোষে প্রজার ঘরে ধান, গম, টাকা যথেষ্ট জমিয়াছে, প্রজা ব্যাটারা মহাজন হইয়া উঠিয়াছে, মেজাজ গরম হইয়া পড়িয়াছে, দল বাঁধিতে শিখিয়াছে, জেলায় গিয়া মোকদ্দমা চালাইতে সাহসী হইয়াছে, ব্যাটাদিকে একদম দুরস্ত করিয়া দিতে হইবে। আবার বল্‌তে শিখেছে—ভোগ দখলী স্বত্ব, কায়েমী স্বত্ব, মৌরসী স্বত্ব, আরে মলো যা! প্রজার আবার কায়েমী স্বত্ব। মৌরসী স্বত্ব! তোর স্বত্ব নিয়ে কিছু করেছে! আমার নিকট দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, লাখরাজ, কিছুই টেকে না, তা আবার ভোগদখলী, রাইয়ত ব্যাটাদের 'চোর্‌ফুট্টি' ঘুচিয়ে দিব, একদম ঘুচিয়ে দিব। এক দমে একলাখ ইরশালের জায়গায় সাতলাখ না করিয়া ছাড়ছি না। কত ব্যাটার হাতে মালা দিয়ে ছেড়ে দিব, তবে না ম্যানেজার!

গৌরাঙ্গ চৌধুরী ও আমি নিজের কাণে ম্যানেজার সাহেবের এ সকল উক্তি শ্রবণ করি নাই। আম্‌লাদের মধ্যে এই সকল কথা লইয়া জল্পনা কল্পনা হইতেছে তাহা শুনিয়াছি। রাইয়ত মহলে ম্যানেজারের কথা

লইয়া যথেষ্ট অন্দোলন হইতেছে তাহাও অবগত হইয়াছি। সেদিন কালিকাপুরে গিয়াছিলাম, সেখানে গুজব্ এই যে, 'নূতন বন্দোবস্ত' তাহারা দিবে না, নূতন বন্দোবস্তের 'সরত' অতি ভয়ানক। এই বন্দোবস্তে প্রজা যদি সম্মত হয়, তাহা হইলে প্রজার সর্ব্বনাশ নিশ্চয়! জমিদারের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে; যখন ইচ্ছা করিবেন, জমিদার প্রজার উপর নূতন বন্দোবস্ত চালাইতে পারিবেন, পদে পদে প্রজাকে জমি জমা হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। কালিকাপুরে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ধনীর বাসস্থান, তাঁহারা সুদী কারবার করেন। আসামীদের উপর চক্রবৃদ্ধির উপরে যদি কিছু থাকে, সেই নিয়মে সুদ আদায় করিয়া অর্থশালী হইয়াছেন, তত্রাচ তাঁহারা ভদ্রলোক, দয়া আছে, দান আছে, পূজা পার্ব্বণ আছে।

কালিকাপুরে ব্রাহ্মণ মহলে দুইটি দল হইয়াছে। সেই কারণে গ্রামের মধ্যেও দুইটি দলের বিকাশ হইয়াছে। একটি দল জমিদারের খয়ের খাঁ গণ দ্বারা পরিচালিত, দেশের লোকে এই দলের নেতাদিগকে মোসাহেব বলিয়া উপহাস করে। বাস্তবিক এই দলটির নায়কগণ আমাদের দলের লোক, এই দলের প্রত্যেক লোকই জমিদারের পরম শত্রু, এই দলই বাহিরে জমিদারের পরম মিত্র। জমিদারকে নাচান, হাসান, কাঁদান এই দলের দ্বারাই হইয়া থাকে। বোকা জমিদার আমাদের ষড়যন্ত্রের প্রভাবে একেবারে মোহিত হইয়া রহিয়াছে। কালিকাপুরের মধ্যে যে সকল ভদ্রলোককে, জমিদার ঘোর শত্রু বলিয়া অবগত আছেন, তাঁহারাই তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী ও প্রচ্ছন্ন বন্ধু। আমাদের ষড়যন্ত্রের প্রভাবে বন্ধু শত্রুবৎ বোধ হইতেছে। শত্রু মিত্র হইয়া, বোকাকান্ত জমিদারের সর্ব্বনাশ করিতেছে। আমাদের দলই জমিদারী সেরেস্তার সকল স্তর অধিকার করিয়াছে; আমরাই মন্ত্রণা দিই। আমাদের

মন্ত্রণাগুণে জমিদার রায় চৌধুরীর অধঃপতন শনৈঃ শনৈঃ হইতেছে। আমরা চারিদিক দিয়া অর্থ শোষণ করিতেছি। শত শত অশান্তির মধ্যে জমিদার মহাশয়কে ঘাড় ধরিয়া ডুবাইয়া রাখিয়াছি, বুঝিবার উপায় নাই, বোঝাইয়া দিবার কেহ নাই। যাহারা হিতাকাঙ্ক্ষী তাহারা বহুদূরে অবস্থান করে, তাহারা নিকটে আসিতে পায় না। আমাদের চক্রান্তে তাহাদিগকে দূরে—অতি দূরে থাকিতে হয়। নূতন বন্দোবস্ত হইবে, এই বন্দোবস্তের মধ্যে আমাদের হাত আঁছে কি না তাহা বলিতে চাহি না, কার্য্যকারণ সম্বন্ধে দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

আমাদের দলের মধ্যে যিনি মোসাহেবী পদ পাইয়াছেন, তিনি খাম্-খেয়ালী বোকা ও মূর্খ জমিদার পুঙ্গবকে এখন ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দেন নাই। ম্যানেজার সেই জন্য এখন মধ্যে মধ্যে রায়চৌধুরীর খাস্‌কামরায় গিয়া দু এক দণ্ড কথা বলিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন। আত্মগৌরব প্রকাশে সমর্থ হইতেছেন। কালিকাপুরের রাইয়তদের কথা লইয়া কয়েকদিন যাবৎ ঘোর আন্দোলন চলিতেছে। যাহারা সহজে বন্দোবস্তে স্বীকৃত হইবে না, তাহাদিগের ভিটা মাটি উৎসন্ন করিতে হইবে, ভিক্ষা করিয়া খাইবার উপায় পর্য্যন্ত রাখা হইবে না। ফৌজ-দারী, দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া রাইয়ত গুলোকে জেরবার করা চাই। নাকালের একশেষ করিতে হইবে, যেন বাপ্ বাপ্ বলিয়া পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়ে। এই প্রকারের পরামর্শ খাস্‌কামরায় হয়। পঞ্চু ঘন ঘন তামাক দিয়া থাকে, আলবোলার নলটি জমিদারের মুখে লাগিয়াই আছে; হো-হো হাসি, প্রায় বাহির হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। শেষে স্থির হইল; কালিকাপুর বাড়ীর নিকটে, যদি কালিকাপুরকে শাসনে আনিতে পারা না যায়, তাহা হইলে কেহই বন্দোবস্ত দিবে না; যে কোন উপায়ে কালিকাপুরের রাইয়তদিকে দুরস্ত করিতেই হইবে। পঞ্চাশ যাট

জন বরকন্দাজ কালিকাপুরে রাখিয়া দাও, বাছা বাছা কয়েক বাড়ীতে তাহারা পাহারা দিবে। বাড়ীর ভিতর হইতে একটি পিপড়ে পর্য্যন্ত যাহাতে বাহিরে না যাইতে পারে তাহা তাহারা করিবে। বাহিরের কোন লোক, যেন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে। হাট, বাজার, দোকান, পশরা কিছুতেই যেন করিতে না পায়। ক্রমশঃ ক্রমশঃ অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইতে হইবে; একটু কেহ কিছু বলিলেই প্রহার করিবে। বরকন্দাজদের রোজ ও খোরাকী তাহারা প্রতিদিন আদায় করিয়া লইবে, না দিলে জোর জবরদস্তি করিয়া রাইয়তের স্ত্রী পরিবারের গহনা কাড়িয়া লইবে।"

কালিকাপুরের দক্ষিণে একটি পুষ্করিণী আছে, সেই দীঘির জলে পল্লীর নরনারীরা স্নান করে, অনেকে সেই জল পানার্থে বাড়ী লইয়া যায়। জমিদারের হুকুম হইল—যে কোন রাইয়ত এই বান্‌-দীঘিতে স্নান করিবে বা জল লইবে তাহাদিগকে প্রহার কর, অপমান কর, কাছারীতে লইয়া গিয়া জরিমানার টাকা আদায় কর,জল বিছুটী দাও। স্ত্রী, পুরুষ, বালক বা বৃদ্ধ বিচার করিও না। রাস্তাঘাটে, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল যাহা পাইবে 'খোয়াড়ে' দাও। আর দেখিও একটি প্রাণী যেন জেলায় যাইতে না পায়। পথে যাহাকে দেখিবে তাহার কাগজপত্র কাড়িয়া মাথা লাল করিয়া দিবে, কাণ ধরিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিবে। এই প্রকার আদেশের উপর আরও কিছু অত্যধিক ছিল, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবে।

বারেশ্বর সমাজদার মহাশয়ের বাড়ী কালিকাপুর, তাঁহার মত সৎলোক অতি দুর্লভ, তিনি জমিদারের অত্যাচারভয়ে কয়েক বিঘা লাখেরাজ ভূমি ব্যতীত অন্য কোন জমিজমা রাখেন না; কেবল বসতবাড়ীটির কিয়দংশের মালগুজারী জমিদারী সেরেস্তায় দাখিল করিতে হয়। তিনি

জমিদারবংশের পরম বন্ধু। তিনি খয়েরখাঁর দলের লোক নহেন, সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে নানান্ কথা জমিদার ও ম্যানেজার পুঙ্গবদ্বয়ের কর্ণে পৌঁছাইতে আরম্ভ করিল; তাঁহার দোষ বিন্দুমাত্র ছিল না, তত্রাচ সাতখানি করিয়া চুকলীখোরেরা লাগাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলে—বীরেশ্বরের আত্মীয়গণ, চাকর বাকর ও আসামীগুলা তাহারই পরামর্শে বন্দোবস্ত দিতে রাজী নহে; সুতরাং নির্দ্দোষী সমাজদারের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। গুজব্ রাষ্ট্র হইল, বীরেশ্বর সমাজদারকে জমিদার হুকুম দিয়া মারিয়া ফেলিবে। ব্যাপার কতদূর গড়ায় তাহা না দেখিয়া, তিনি রাত্রের মধ্যেই সদরে পলাইয়া গেলেন। প্রাতঃকালে পাঁচজন যমদূতের মত বরকন্দাজ সমাজদার মহাশয়ের সদর বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সদর বাড়ীতে একখানি বাংলা ঘর ছিল, সেই ঘরে বসিয়া সমাজদার মহাশয় আসামী পত্রের সহিত দেনা পাওনা করিতেন, এদেশে এই কর্ম্মস্থানকে 'গদীঘর' বলে। মহাজনের বসিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান থাকে, বরকন্দাজ সাহেবেরা সেই গদীঘরে গদীর উপর গিয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—বীরেশ্বর কাঁহা হ্যায়! খোরাকী লে আও, রোজ ভি লে আও! ভয়ে বাড়ীর লোক শঙ্কিত হইয়া পড়িল। বীরেশ্বরের পুত্র কৃপাসিন্ধু যুবক, বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া বরকন্দাজ সাহেবদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; খোরাকী ও রোজের কথা শুনিয়া প্রত্যেকের জন্য আট আনা হিসাবে আনিয়া দিলেন। গোলামের জাতগুলা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—নেহি নেহি এক এক রোপেয়া করকে দেনে হোগা! কৃপাসিন্ধু কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কালিকাপুরের বাজার প্রতিদিন বসে, গ্রামের মধ্যেই বাজার। দুগ্ধ, মৎস্য তরিতরকারী বাজার হইতে না লইলে এক দিনও চলে না। বাজারসরকার চাকর লইয়া বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইল, চাকরের

হাতে "দুধের ভাঁড়" ও ঝুড়ি। একজন বরকন্দাজ বলিল—কোথায় যাও? উত্তর হইল বাজার! বরকন্দাজ বাহাদুর গদীর উপর হইতে উঠিয়া, হাতের লাঠি দিয়া দুধের ভাঁড়টি ভাঙ্গিয়া দিল, চাকরের গালে ভীষণ চপেটাঘাত করিল। বলিল—বাহির মৎ যাও? একজন ভৃত্য রন্ধনের জন্য কাষ্ঠ কাটিতে আসিল—তাহার কুড়ালী কাড়িয়া লইয়া তাড়াইয়া দিল। বীরেশ্বর সমাজদার মহাশয়ের বাড়ীর মত ব্যাপার আরও পাঁচ ছয়টি বাড়ীতে আরম্ভ হইয়াছে।

ম্যানেজার মহাশয়ের হুকুম যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে না—ইহা তাঁহার ধারণা হইয়াছে। এ ধারণা একেবারে অমূলক নহে, কারণ জমিদারী সেরেস্তা, আমাদের দলের লোকে প্রায় পরিপূর্ণ। দেশের লোকের উপর যে সকল অকথ্য উৎপীড়নের আদেশ দিতেন তাহা প্রায়ই উপেক্ষিত হইত। তিনি স্থির করিলেন মফঃস্বলের ডিহীর বিশেষ কালিকাপুরের নায়েব, গোমস্তা, পাইক প্রভৃতি একেবারে অকর্ম্মণ্য—এইরকম ভীরু ও অকর্ম্মণ্য লোকের দ্বারা জমিদারী শাসন মোটেই হইতে পারে না। দিন কয়েকের মধ্যে তাঁহার দেশের—শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের কতিপয় ভদ্রাভদ্রলোক সদরকাছারীতে আসিয়া পৌঁছিল। কালিকাপুরের কাছারীর আমলাদিগকে তথা হইতে স্থানান্তরে বদলি করিয়া দিলেন। আপনার আনীত লোকগুলির মধ্যে কয়েকটিকে কালিকাপুরে বাহাল করিলেন।

কালিকাপুরের প্রজাসাধারণের উপর অত্যাচার ভীষণরূপে আরম্ভ হইল। গ্রামের মধ্যে বরকন্দাজ, পাইক ও একজন আমলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ম্যানেজারের হুকুম অনুসারে পল্লীপথে, ভদ্রলোক এমন কি স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত অপমানিত হইতেছেন। রাস্তায় দাঁড়াইয়া অশ্লীল গান গাহিতেছে—কতপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ

করিয়াছে। ভদ্রলোকেরা স্ত্রী পরিবারবর্গ লইয়া ভীষণ উদ্বেগসহ দিন অতিবাহিত করিতেছেন।

একদিন জনৈক ভদ্র ধনীর একজন ভৃত্যের যুবতী স্ত্রী—মনিব বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই দেখিল—মনিব বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখে জন কয়েক পাইক দাঁড়াইয়া হল্লা করিতেছে। বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। ছোটলোকের মেয়ে, লজ্জা বড় বেশী নাই, বলিল তোমরা রাস্তা ছাড়িয়া হল্লা কর? লোকজন কি রাস্তা দিয়া চলিবে না! আর যায় কোথায়, পাইকগুলার মধ্য হইতে একজন লাফাইয়া আসিয়া যুবতীর চুল ধরিয়া একটা ঘুরপাক্ দিল; অন্য একজন পাইক যুবতীর পরিধেয় বস্ত্র বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল, রমণী পূর্ণ উলাঙ্গিনী হইয়া পড়িল। প্রকাশ্য দিবালোকে—গ্রামের মধ্যে এই বীভৎস ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইতেছে—কেহ সাহায্য করিতে আসিতেছে না স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিতেছে। পাইকগুলা রমণীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কতপ্রকার অঙ্গভঙ্গীসহ অকথা কুকথা বলিতেছে। রমণীর লাঞ্ছনার আর বাকি রহিল না, শেষে তাহার স্বামী এই সমাচার অবগত হইয়া পাড়ার জন কয়েক লোকসহ দৌড়িয়া আসিল—তাহাদের হাতে লাঠি ছিল। পাইক-গুলার উপর জোরে লাঠি চালাইল। ইত্যবকাশে রমণী বস্ত্রখণ্ড দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া প্রস্থান করিল।

ক্রমেই ছোটলোকের পাড়া হইতে লোক আসিয়া জমায়েৎ হইল, বেগতিক দেখিয়া পাইকেরা প্রস্থান করিল। নিকটেই কালিকাপুরের জমিদারী কাছারী, পাইকেরা তথায় গিয়া হাঁপাইয়া পড়িল। পাইকেরা প্রস্থান করিলে পর, ভদ্রলোকের মুখ দেখিতে পাওয়া গেল, তাঁহাদের তখন আস্ফালন দেখে কে! কেহ কেহ জমিদারের উপর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে ক্রুটি করিলেন না, অর্থ বল, বাহু বলের বাহাদুরী

করিলেন, কিন্তু যতক্ষণ পাইকগুলা ছিল, ততক্ষণ তাঁহারা অন্দরমহলে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। এ বীরত্বের বাহাদুরী আছে! কিন্তু প্রশংসা নাই।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, সেই ছোটলোক পাড়ায় 'আগুন আগুন' বলিয়া চীৎকার উঠিল। যথার্থই অগ্নিদেবের লোলজিহ্বা দূর হইতে দৃষ্টিপথে পড়িল। চীৎকারের উপর চীৎকার করিতেছে। গৃহস্থেরা নিদ্রাঘোরে অচেতন প্রায় ছিল, হঠাৎ আকস্মিক বিপদে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য হইয়া, কি করিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। পরিশেষে পুত্র কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া গৃহের বাহির হইল। যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইতেছে—উপায় নাই। জমিদারের লোকে এই অগ্নিকাণ্ড করিয়াছে। পল্লীটি ক্ষুদ্র—লোক জনও বেশী নাই। জমিদারের পাইক প্রায় ৪০ চল্লিশ জনের অধিক হইবে দৌড়িয়া আসিল। জন কয়েক পুরুষ ও জন কয়েক স্ত্রীলোককে ধরিয়া প্রহার করিতে করিতে ডিহীতে লইয়া গেল—যাহারা অগ্নি নির্ব্বাণার্থ গ্রামের মধ্য হইতে আসিয়াছিল—তাহাদের মধ্যেও জন কয়েককে ধরিয়া লইয়া গেল। ব্যাপার বুঝিতে আর বাকি রহিল না। অন্যান্য সকলে গ্রামের মধ্যে পলায়ন করিল। দরিদ্রের কুঁড়েঘরগুলি দাঁড়াইয়া পুড়িয়া গেল।

জমিদারী কাছারীতে গিয়া পুরুষগণকে প্রচুর পরিমাণে প্রহার করা হইল। পুরুষগণের সম্মুখে তাহাদের ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতির উপর পাশবিক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, এ প্রকার অত্যাচার মানব হইয়া মানবের উপর করিতে পারে না, ইহারই নাম জমিদারী শাসন। জমিদারীর বন্দোবস্ত এই প্রকারেই করিতে হয়! যে বন্দোবস্ত মহল নয়, মহলের প্রজা দুষ্ট নয়, রাজস্ব দিতে বিলম্ব করে না, খাজনা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হারেই লওয়া হয়, তত্রাচ আশা মিটে না।

প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে সম্ভবতঃ এই বন্দোবস্তের সূচনা হইয়াছে !

কালিকাপুরের ভদ্র অভদ্রকে আসামী করিয়া মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। একমাত্র এই গ্রামেই, ইতিমধ্যে দুইশত নম্বর ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ক্রমশঃ ভদ্র পরিবারবর্গের উপর অত্যাচারের সূত্রপাত হইল। রানদীঘির ঘাটে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিতে পারে না, তথায় পাইক বসিয়া থাকে ; তাহারা প্রায় উলঙ্গ ভাবেই বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকে—অশ্লীল গান মুখে লাগিয়াই আছে। দৈবাৎ কোন স্ত্রীলোক জল আনয়নার্থ আগমন করিলে তাহাকে বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছিত না করিয়া ছাড়িত না। পুরুষগণেরও অপমানের একশেষ করিত। দিন কয়েকের মধ্যে রানদীঘির তীরে, গ্রাম্য পথে, বাজারে আর লোকজন চলা ফেরা আদৌ করিতেছে না দৃষ্ট হইল, গ্রামবাসীর কষ্টের একশেষ হইয়াছে। যাহারা জমিদারের খয়ের খাঁ—তাহারা অবলীলা ক্রমে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে, যাহারা জমিদার কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতেছে, তাহাদিগকে ঠাট্টা করিতেছে টিট্‌কারী দিয়া কথা বলিতেছে, মধ্যে মধ্যে অপমান করিতেছে।

এই প্রকারে এক একটি দিন চলিয়া যাইতেছে—'দিন দাও মা দীনতারিণী।' কাহার সাধ্য নাই যে গ্রাম হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র গমন করে। বাহিরে প্রতিকারের চেষ্টা করিবার আদৌ উপায় নাই। কেহ কেহ বন্দোবস্ত করিতে রাজী হইয়াছে—সর্ত্ত ও টাকার কথা শুনিয়া তাহাদের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিতেছে।

কেবল যে কালিকাপুরের বন্দোবস্ত লইয়া এই প্রকার লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে তাহা নয় ! জমিদারীর সর্ব্বত্র এই বন্যার প্রবল তরঙ্গ

ছুটিয়াছে। উৎপীড়নের অভিনয় সর্ব্বত্র আরম্ভ হইলেও সর্ব্বত্র কাপুরুষের সংখ্যা এতাদৃশ নহে। কিছু দূরে 'সেরসাহবদীয়া' নামক মোসলেম-জনগণ পরিবেষ্টিত পল্লীনিচয়ে বন্দোবস্তের তরঙ্গ ছুটিল, তথায় একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ কর্ত্তন ব্যাপার লইয়া—মোস্লেমগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইবা মাত্র, ম্যানেজার মহাশয় বুঝিলেন এ কঠিন মৃত্তিকায় বিড়ালের নখর বসিবে না, তথায় যথেষ্ট জ্ঞানার্জ্জন হইয়াছিল।

জমিদার জব্দ সেরশাহবাদীয়ার নিকট, তাহারা ভাল মানুষের নিকট ভালমানুষ—আর দুষ্টের যম। বন্দোবস্তের কথা দূরে থাকুক, তথায় খাজনা আদায় পর্য্যন্ত বন্ধ হইল, জমিদারের সকল চেষ্টা ও উত্তম তথায় ব্যর্থ হইয়া গেল। অমরাবাদের প্রজারা বন্দোবস্ত দিল না, কত ঘর জ্বালানী মোকদ্দমা হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

কালিকাপুর, মালিগুঞ্জ প্রভৃতি পল্লীবাসীরা ছয়মাসকাল বিবিধ অত্যাচার উপভোগ করিয়া শেষে বন্দোবস্ত দিতে স্বীকৃত হইল। যাহাই হউক এই বন্দোবস্ত ব্যাপারে একলক্ষ টাকার স্থানে ছয়লক্ষ টাকা আয় দাঁড়াইল। জরিমানা বাবদে তিনলক্ষ টাকা আদায় হইল।

গণেশজাতি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। ম্যানেজার সাহেব লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করিলেন। শত শত প্রজা ফকিরী লইল। মহাজনের দেনার দায়ে—জমিদারের খাজনার দায়ে শত শত প্রজার বাস্তভিটা পর্য্যন্ত নিলাম হইয়া গেল! বহু প্রজার জমি জমা মায় বাস্ত ভিটা জমিদারের খাস দখল হইল। সেই বন্দোবস্তের ফলে আমাদের সোনারদেশে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। দারিদ্র্যতার কঠোর শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। সেই দিন হইতে দেশ আর সুস্থ হইতে পারে নাই। অন্নাভাব দরিদ্র মহলে চিরকালের জন্ত প্রবেশ করিল, স্বতন্ত্র চেষ্টাতেও আর দেশের বা আনা

অধিবাসী পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল না। কোদ্‌লাবাথানের জমিদারের জয়জয়কার হইল, অবস্থা ফিরিয়া গেল; আশা হইয়াছে অচিরাৎ রাজাবাহাদুর খেতাব লাভ হইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ



গৌরাঙ্গ চৌধুরীর পরলোক প্রাপ্তি

"পাঁচ ঠাঁই ভাঁড়ুর মাথায় রাখে চুলি।
নাগরিয়া লোক গালে দেয় চূণ কালী॥
পূরের কোটালে আসি শিরে ঢালে ঘোল।
পাছে পাছে ভাঁড়ুর বাজায় কেহ ঢোল॥
মালাকার আনি গলে দিল ওড় মালা।
টিট্‌কারী দেয় যত নাগরিয়া বালা॥
পূরের বাহির করি মারে বেড়া বাড়ি।
কাল হাঁড়ি ফেলে মারে কুলের বছড়ি॥

* * * *

ঠক নাবড়ে শুনে এই কথা কর্ণ ভরি
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে দুর্গাপদ স্মরি॥"

(কবিকঙ্কণ)

আমার মাকে পাইয়া অবধি আমি সংসারী হইয়াছি। ভোলা বাবাজী ও আর আর সকলেই আমার বাড়ীতেই থাকেন। ভোলা বাবাজী ভোরে উঠিয়া করতাল ধ্বনি সহ "রাই জাগ, রাই জাগ" গানে পাড়াটি কম্পিত করিয়া তুলেন। বাধ্য হইয়া পাড়া পড়শীরা খুব ভোরে

শয্যাত্যাগ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। সহুরে বাবুদের মধ্যে অনেকেই জীবনে সূর্য্যোদয় দর্শন করেন নাই, আমাদের পাড়াগাঁয়ের ছোট ছেলেটি পর্য্যন্ত উষার দিব্যজ্যোতি দর্শন করে। ভোলা বাবাজী "রাই জাগ" গান গাহিতে গাহিতে এবং ঝমাঝম্ করিয়া করতাল বাজাইতে বাজাইতে গোটা পল্লীটি প্রদক্ষিণ করিয়া মালতীকুঞ্জে যান। মালতী সমাজের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করতাল বাজাইতে বাজাইতে "যশোদা থুইল নাম যাদুবাছাধন" আরম্ভ করেন। এ সুদীর্ঘ গানও শেষ হইতে চাহিত না আর নৃত্য ও থামিত না। এইটি তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে হইয়াছিল।

আমাদের দেশটি ত একে কৃষ্ণ-ভক্তের দেশ, তদুপরি ভোলা বাবাজীর কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের গুণে এবং নিত্য সন্ধ্যার সময় খোল করতাল লইয়া হরি সংকীর্ত্তন করাতে, আমাদের মালীগঞ্জ যেন বৃন্দাবন ধাম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সকলের বাড়ীতেই তুলসীবন। সকলের নাসিকায় তিলক। আর যুবক যুবতী হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধাণী পর্য্যন্ত সকলেই সন্ধ্যা আহ্নিক ও মালাজপ করিয়া থাকেন। বিশেষ আমাদের গণেশ জাতিটি বড়ই শান্তিপ্রিয় জাতি, আমাদের মধ্যে সকলেই গৌর ভক্ত, 'গৌর নিতাই' নামের পাগল। বন্ধু বান্ধবের দর্শনে 'গৌর, গৌর, নিতাই, নিতাই,' বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকি।

আমাদের জাতির মধ্যে বিবাহে যথেষ্ট ব্যয় হইয়া থাকে, পূর্ব্বে কন্যার পিতামাতাকে, দশ, কুড়ি টাকা পন স্বরূপ দিলেই বিবাহ হইত। ক্রমে সেই পনটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে দুই তিন শত টাকায় উঠিয়াছে। আমাদের জাতীয় পুরুষের মধ্যে অনেকেই বিবাহ করিতে পারে না। যাহাদের কিঞ্চিৎ ভূ-সম্পত্তি আছে, তাহারা কালিকাপুরের মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিয়া বিবাহ করে। বিবাহ হয় সত্য কিন্তু বৎসর পাঁচেকের

মধ্যেই সুদে আসলে ঋণের টাকা এতাদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, তাহাতে স্ত্রী পুত্র ব্যতীত অপরাপর স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি মহাজনের গৃহে প্রবেশ করে; মহাজনের ঋণের দায়ে সকলকেই উদাসীন হইতে হয়। আমি বাল্যকাল হইতেই দেখিতেছি, আমার জাতি বিবাহের দায়ে ফকীর হইতেছে। রাজা, মহাজন ও বিবাহ এই তিনটিতে আমাদের জাতির বংশলোপ হইতেছে এবং দরিদ্র হইতেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে মহাজনের নিকট চাকর থাকিয়া অগ্রীম টাকা লয়, মাহিনা বাবদে মাসে মাসে সেই টাকা শোধ যায়। এই প্রকারে টাকা লইয়া যাহারা বিবাহ করে, তাহাদের জীবনে আর দাসত্ব ঘুচে না, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সেই বংশ মহাজনের বাড়ীতে দাসত্ব করিতে থাকে। সুতরাং বিবাহ ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে একটা অসাধারণ ব্যাপার, এই অসাধারণ ব্যাপারের মীমাংসা ভোলাবাবাজী করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় বংশও রক্ষা হইতেছে, দেনার দায়ে মাথাও বিক্রয় হইতেছে না। তিনি 'মালা চন্দনের' প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। প্রকারান্তরে বিধবা বিবাহের প্রথার প্রচলন করিয়া জাতীয় ক্ষয় নিবারণ করিয়াছেন। যদিও এই প্রথা তাঁহার উদ্ভাবিত নহে, তত্রাচ আমাদের জাতির মধ্যে, আমাদের গ্রামে, সর্ব্ব প্রথম তিনিই এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। সেই জন্য ভোলা বাবাজীর নাম এতদ-ঞ্চলে যথেষ্ট আছে। এক্ষণে প্রায় সমগ্র গণেশ জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাতে জাতিভেদ নাই, বিশ্বপ্রাণতা আছে। জাতীয় সমন্বয় সাধন দ্বারা আমরা একটি বৃহৎ জাতিতে পরিণত হইতেছি, এই নব জাতিটির নাম বৈষ্ণব বা বৈরাগী। হিন্দু হইলেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দয়ায় জীব উদ্ধার হইয়া যায়। পৃথিবীর সকল জাতিই 'বৈষ্ণব' হইতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান নেতাগণের হৃদয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ পথে চালিত হইয়া, একেবারে ক্ষুদ্রতম হইয়া পড়িয়াছে। অজ্ঞ

একটি উদার বিশ্ব-প্রেমময় পবিত্র ধর্মটি তাঁহাদের নিকট ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়াছে। জীব উদ্ধারের মহৎ সিংহদ্বারটি, যেন শৃগালের গুহা মুখে পরিণত হইয়াছে।

ভোলাবাবাজী আমাদের জাতি ব্যতীত যে সে হিন্দু জাতিকেই তাঁহার ধর্ম্মে, তাঁহার সম্প্রদায় ভুক্ত করিতে আরম্ভ করেন। এই যে ধর্ম্মাশ্রয়, এই যে একটি সম্প্রদায়, ইহাতে তাঁহার দল অচিরাৎ পুষ্টলাভ করিল; তাঁহারা সকলেই জাতিতে 'বৈষ্ণব' হইলেন। পুরুষ মাত্রেই বৈষ্ণব এবং স্ত্রী মাত্রেই বৈষ্ণবী। মুখে সদাই 'গৌর নিতাই' বলেন, কৃষ্ণ মহিমা কীর্ত্তন করেন। আবশ্যক হইলে ভিক্ষা করেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যে কোন বাধা নাই, বিধবা বিবাহে দোষ নাই, বিবাহে ব্যয় নাই বলিলেই হয়; সুতরাং আমাদের গণেশ জাতিটি ভোলাবাবাজীর কৃপায় উদ্ধার হইয়া গেল। ভোলাবাবাজীর দলের লোকগুলি একটি জাতি হইতে আইসে নাই। যাহাদের জল একেবারে অচল ছিল, তাহারা 'বৈষ্ণব' হইবার দিবস হইতে জল-চল জাতি হইয়াছে। এই দলের জল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করেন, এই সম্প্রদায়ের অন্ন, ব্যঞ্জন দেশের শ্রেষ্ঠতর সকলেই গ্রহণ করেন।

গণেশ জাতির স্ত্রীপুরুষ এক্ষণে অঙ্গুলিপর্ব্বে গণনা করা যায়। আমার মনে হয় আর দশবৎসরের মধ্যে সর্ব্ব মতের এই জাতির নরনারী সংখ্যা দশ বারটিতে দাঁড়াইবে। সর্ব্বত্র এই জাতি 'বৈরাগী' হইতেছে, দশটি জাতি মিলিত হইয়া একটি জাতি হইতেছে। ভবিষ্যতে যে জাতির পণ-প্রথা অত্যধিক, সেই সকল জাতি মাত্রেই 'বৈরাগী' হইয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি—নিজের জাতির কথা, নিজের ঢাকে মধ্যে মধ্যে দুই এক কাটি বাজাইব। অনেকক্ষণ বাজাই নাই। সুযোগ বুঝিয়া ফাঁকে ফাঁকে এক কাটি সঙ্গত করিয়া লইলাম।

এইবার গৌরাঙ্গ চৌধুরীর কথা বলিব। গৌরাঙ্গ চৌধুরীর দুইটি পুত্র ও একটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কন্যাটি জেষ্ঠ্যা। বড় ছেলেটির নাম অভয়, ছোট ছেলেটির নাম পাঁচু। গৌরাঙ্গ চৌধুরী বৈরাগীদের উপর অতিশয় চটা ছিলেন। দেখিয়াছি, ঘৃণাও করিতেন, কেন যে ঘৃণা করিতেন তাহার কারণ বুঝিতে পারি নাই। বোধহয় এই জন্যই "মালতীকুঞ্জ" ত্যাগ করিয়া রহমৎগঞ্জে বাস করিতেন।

যখন কন্যার বিবাহ দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত, সেই সময়ে আমি মাতার অনুরোধে ও ভোলাবাবাজীর পরামর্শে 'বৈষ্ণব' হই। আমার বিবাহের জন্য একটি পাত্রীও ঠিক হয়। দশ বার দিবসের মধ্যেই মালা-চন্দন হইবে তাহার উদ্যোগ আয়োজনও হইতেছে। এমন সময়ে গৌরাঙ্গ চৌধুরী ভোলাবাবাজীকে ডাকিয়া গোপনে কি পরামর্শ করিলেন, মাকে তিনি কি বলিলেন। গৌরাঙ্গ চৌধুরীর বৈষ্ণব বিদ্বেষ দূর হইয়া গিয়াছে; তাঁহার কন্যার সহিত আমার মালা-চন্দন হইল। আমার বৈষ্ণবীর নাম রাধারাণী। আমার নামের কোনই পরিবর্ত্তন হইল না, আমার নাম সেই গণেশ রহিল। এই বিবাহে গৌরাঙ্গ চৌধুরী প্রচুর ব্যয় করিয়াছিলেন। অভয় বিবাহের পর কয়েক বৎসর জীবিত ছিল। ছোট পাঁচু কোদ্‌লাবাথানের স্কুলে পড়ে। আমার বিবাহের পর হইতে শ্বশুর মহাশয় মালতীকুঞ্জে আসিয়া বাস করেন।

জমিদার মহাশয়ের ম্যানেজার সাহেবের অত্যাচার দিন দিন যখন প্রবল হইয়া উঠিল, তখন আমাদের দলের মাথা ধরিল। জমিদারের কর্ণে মন্ত্রজপ আরম্ভ হইল। যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—তিনিই ম্যানেজারের দুর্নাম করেন, টাকা চুরির কথা বলেন। আফিমখোর জমিদার—আফিমের নেশায় কত খেয়াল দেখেন। জমিদারের মাথাটাও বড় প্রকৃতিস্থ নহে, এমন খামখেয়ালী বদরাগী লোক সম্ভবত পৃথিবীতে

আর মিলিবে না। কথার ঠিক রাখা ইহাঁর কুষ্ঠিতে লেখে না, কাহাকেও বিশ্বাস নাই, সকলেই শত্রু। আজ যাহাকে মিত্র বোধে গ্রহণ করিলেন, দুই দিন পরেই তাহাকে ঘোর শত্রু বোধে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এ রকম পাগল বা ইডিয়েট্ ধরণের লোক দুর্লভ! যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কোদ্‌লাবাথানে যাইলেই দেখিতে পাইবেন।

ম্যানেজার সাহেবের এক দিন খাস্‌কামরায় ডাক পড়িল। আফিমের নেশা ধরিয়াছে, শটকার নলে মুখ দিয়া—জমিদার বাবু মোসাহেবগণে পরিবৃত হইয়া গল্প করিতেছেন। রাম সিং ঘণ্টায় তিন চারিবার গোলাপ জলে ভিজান গাঁজা, লম্বা পাথরের কলিকায় সাজিয়া দিতেছে, জমিদার মহাশয় তাহা সেবা করিতেছেন। চক্ষু দুটি জবার মত লাল হইয়াই আছে। এমন সময়ে ম্যানেজার সাহেব তথায় উপস্থিত হইলেন।

তিনি পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই যে তাঁহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবেন, তাহার বিন্দু মাত্রও অবগত ছিলেন না। জমিদার মহাশয় ম্যানেজারকে দেখিয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, বসিতে অবকাশ না দিয়াই বলিলেন—শালা লোককো নিকাল দেও? রাম সিং দাঁড়াইল—রাম সিংকে হুকুম দিলেন এবং বলিলেন—শালা লোককো হামারা এলাকাসে কাণ পাকড়কে নিকাল দেও? আদেশ পালন করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইল না। ম্যানেজার মহাশয় আপন জিনিস পত্র লইয়া ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া সেই দণ্ডেই প্রস্থান করিলেন।

দেশের প্রজার হৃদয়রক্ত লইয়া জমিদার মহাশয় প্রচুর ধনের অধিকারী 'হইয়াছেন। জমিদারের আয় পাঁচগুণ বৃদ্ধি করিয়া ম্যানেজার মহাশয় শেষে যে পুরস্কার পাইলেন তাহা আপনারা অবগত হইলেন। আমরা যুক্তি পরামর্শ দিয়া একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।

একটি হাইস্কুল খুলিয়াছি। তাহাতে দেশের লোকের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। একটি টোল খুলিবার কথা চলিতেছে।

গৌরাঙ্গ চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র পাঁচু এই বিদ্যালয়ে পড়ে, তাহার স্বভাব দিন দিন খারাপ হইতেছে। শ্বশুর মহাশয়ের কঠিন পীড়া হইয়াছে—আরোগ্যের আশা নাই, শাশুড়ী ঠাকুরাণী ভীষণ চিন্তিতা। পাঁচু মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া বাড়ী প্রবেশ করিল। সেইদিন পাঁচুর মাত-লামিতে পাড়ার লোক বিব্রত হইয়া উঠিল। পাড়ার বৌ ঝি পাঁচুর উৎপাতে অস্থির হইয়াছে। পাড়ার লোক পাঁচুকে একদিন প্রহার করিয়াছিল। পাঁচুর অত্যাচারে শ্বশুর মহাশয় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি পাঁচুকে তেজ্যপুত্র করিয়া গোপনে আমার নামে একখানি উইল করিয়া রাখিয়াছিলেন—সেই রাত্রে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সম্মুখে আমার হস্তে উইল খানি দিয়া, শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ভরণপোষণের ভার আমার উপর অর্পণ করিলেন। তাহার পরদিন গৌরাঙ্গ চৌধুরী মারা যান। পাঁচু মদ খাইয়া কোথায় পড়িয়া ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে গৃহে প্রবেশ করে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ



জমিদারের উন্মত্ত ভাব

"চণ্ডীর চরণ ধরি, কান্দে স্বর্গ বিদ্যাধরী,
অচেতন হয়ে মায়া মোহে।
ধূলায় লোটায়ে কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্ধে
বসন ভিজিল তার লোহে ॥
কেন দিলা গুরু শাপ, কিবা হৈল মম পাপ,
মোর তরে পোহাল রজনী।
রোষযুক্ত ভগবতী, হৈল মোর অধোগতি,
কিরূপে এড়াব পাপ-বাণী ॥"

(কবিকঙ্কণ)

ম্যানেজার সাহেব চোখের জলে নাকের জলে কোদালীয়াবাথান ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর আক্কেল খুব হইয়াছে। যাই হউক দশ টাকা হাতে করিয়াই তিনি এদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। জমিদার মহাশয় এখন স্বয়ং কাছারী করেন, কাছারীতে বসেন দু এক ঘণ্টা। কর্ম্মচারীদের পোয়াবার, দু টাকার মুখ দেখিতে পাইল। মর্‌তে মর্‌ল রাইয়ত গুলা। কাহার পৌষ মাস, কাহার সর্ব্বনাশ। ধুতুরার বীজ মিশান, গোলাপজলে ভিজান গাঁজা হরদম্ চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে দু চার ছিটা গুলিও চল্‌তে আরম্ভ হয়েছে! জমিদারের নিকটে যাওয়া প্রজার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। রাইয়তকে দরখাস্ত দ্বারা আবেদন

নিবেদন করিতে হয়। দরখাস্তের ফিজ্ দুই টাকা, জমিদারের নজরানা এক টাকা, তদুপরি আমলা ফয়লার নজরানা আলাহিদা না দিলে দরখাস্ত পেশই হইবার উপায় নাই।

চব্বিশ ঘণ্টা জমিদার-পুঙ্গবের চক্ষু দুটি লাল হইয়া আছে। সদাই বিরক্ত, সদাই ক্রোধ, সদাসর্ব্বদা সন্দিগ্ধচিত্ত। কে বা কাহারা তাঁহাকে বিষ খাওয়াইবে। কাহার হাতের জলটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, মনের উদ্বেগ বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিশ্বটা যেন তাঁহার গলা টিপিয়া মারিবার জন্য নিয়ত হাত বাড়াইয়াই আছে। লোকটা ছেলে-বেলা হতেই মাথাপাগ্লা গোছের ছিল, ভোগের জোরে শরীরটি বেশ নাদুশ্ নুদুশ্ রহিয়াছে। চেহারাটী যেমন স্থূল, বুদ্ধিটিও তদ্রূপ, তদুপরি মোসাহেবদের তোসামদী, আর টাকার গরম। হরদম্ গঞ্জিকা সেবন, মধ্যে মধ্যে এক আধ গ্লাস বিলাতী সরাপ্ পান ইত্যাদি বিবিধ কারণে তাঁহার মেজাজটা বড় প্রকৃতিস্থ নহে। জমিদার মহাশয়ের মিছরীর ছুরী বন্ধুগণ পরামর্শ দিলেন—এবার একজন সাহেব ম্যানেজার রাখা উচিত, দুদিন পরে রায়বাহাদুর হউক বা রাজা খেতাব হউক পাইবার সম্ভব আছে। আর এত টাকা থাকিতে স্বয়ং জমিদারীর কাজ কর্ম্ম দেখাটা শোভা পায় না।

ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় ইতিমধ্যেই তিন চারিটি কন্যারত্ন গৃহ আলো করিয়াছেন। দুইটির বিবাহও হইয়াছে। পুত্র হইল না, পুত্র হইল না করিয়া—কত সাধ্য সাধনার পর, একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মধ্যে পুনশ্চ বিবাহ করিবার মতলবটাও হইয়াছিল।

একদিন জামাতা সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে আগমন করিয়াছেন—কন্যার একটি কন্যা হইয়াছে; তাই সাধ করিয়া পিতাকে তাঁহার নাত্নীকে দেখাতে এসেছেন। খোকাবাবুর সহিত খুকুমনী খেলা করিতে করিতে

—খোকাবাবু পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠে, জমিদার মহাশয় ক্রন্দনের শব্দে দৌড়াইয়া গিয়া দেখেন, নাতনী হাসিতেছে, খোকাবাবু কাঁদিতেছে। আর যায় কোথায়! প্রথমে ত পায়ের এক ধাক্কায় নাতনীকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—খুকুমনী ককিয়ে কেঁদে উঠল। তার পর খোকাবাবুকে কোলে করে স্বীয় কন্যার গণ্ডদেশে বিরাশী ওজনের একটি চপেটাঘাত করিলেন। কন্যা পিতার আদর দেখিয়া যথায় তাঁহার মা বসিয়াছিলেন—সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। জমিদার মহাশয়ের স্ত্রীর নাম সাবিত্রী। যথার্থই সাবিত্রা—রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। এ প্রকার সতী সাধ্বী দয়াবতী রমণী ভুবনে দুর্ল্লভ। তিনি সেই সময়ে শিবপূজা করিতেছিলেন। কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উন্মাদের ন্যায় প্রভু দৌড়িয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সাবিত্রী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, শিবলিঙ্গের সম্মুখে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন! শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি কটূক্তি—এমন কি 'শ' কার 'ব' কার উচ্চারণ করিতে করিতে ধ্যানরতা সাবিত্রীর পৃষ্ঠে ভীষণবেগে পদাঘাত করিলেন। সাবিত্রী উপুড় হইয়া শিবলিঙ্গের উপর 'মুখ থুবড়ী' খাইয়া পড়িয়া গেলেন। পুনশ্চ এক লাথি, অজস্র গালিবর্ষণসহ পুনশ্চ আর এক লাথি, সাবিত্রীর কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িল, নাসিকা দিয়া রক্ত গড়াইল। কন্যাটী মাতার দুরাবস্থা দর্শনে যেমন মায়ের উপর উপুড় হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে গেলেন—অমনি কন্যার পৃষ্ঠে লাথির উপর লাথি, কিলের উপর কিল পড়িল। মাতা ও কন্যা গৃহতলে লুণ্ঠিতা হইলেন—উভয়েরই জ্ঞান লুপ্ত হইল। রণজয়ী সেনাপতি পুত্রসহ খাসকামরায় প্রবেশ করিয়া হুকুম দিলেন—দশ মিনিটের মধ্যে জামাতা বাবাজীকে স্ত্রী ও কন্যাসহ তাঁহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইবে, না যাইলে পাইক দ্বারা বিতাড়িত করা হইবে তদুপরি আদেশ হইল ষ্টেট হইতে কোন প্রকার জানবাহন পাইবে না।

ঝি আসিয়া সাবিত্রীর মুখে জল দিল—সাবিত্রী চেতনা লাভ করিয়া কন্যার সেবা করিতেছেন—এমত সময়ে এক জন ভৃত্য—পেয়ারের চাকর আসিয়া সাবিত্রীকে বলিল—বাবুর হুকুম এই দণ্ডেই তাঁর কন্যাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিতে হইবে। মায়ের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল তিনি স্বামীর নিকট দৌড়াইয়া গিয়া পা দুখানি ধরিয়া কাঁদিলেন—একদিনের জন্য এই আদেশ মুলতুবী রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। স্বামী মহাশয় পদাঘাতে স্ত্রীর প্রার্থনা খারিজ করিয়া দিয়া, পেয়ারের চাকরটিকে বলিলেন—দূর করিয়া দাও। সে ছোট লোক, তাহার সাহস হইবে কেন, সে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া প্রভু স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া সতীসাবিত্রীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহিরে আনিয়া সবলে ছুড়িয়া দিলেন। সতীসাবিত্রী সাক্ষাৎ ভগবতীরূপিণী মা আমার ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া, বেগে বারাণ্ডায় পড়িয়া গেলেন।

রায়চৌধুরী মহাশয় বজ্রগম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতে করিতে জামাতা বাবাজীকে 'শ' কার 'ব' কারাদ্য সম্বোধনে গালি দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন—শালা লোক্‌কো নিকাল দেও! তিলার্দ্ধ অবকাশ দিবে না। কাজেই কন্যা জামাতা ও খুকুমনিসহ ঝি চাকর লইয়া ভিখারীর ন্যায় রায়চৌধুরী মহাশয়ের গৃহ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়া দুই খানি গো-শকট ভাড়া করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই দিন হইতে কোন কন্যা, পিতৃভবনে আর পদার্পণ করেন নাই। এই প্রকারে কন্যা জামাতা সম্মানপর্ব্ব সমাধা হইল।

সেই দিন হইতে গাঁজা চরশের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। যারা [illegible] সতীসাবিত্রীর নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারিলেন না। [illegible] রায়চৌধুরীর উপর পতিত হইল। স্ত্রীর পৃষ্ঠে [illegible] রায়চৌধুরী মহাশয়ের দক্ষিণ পদে দারুণ যন্ত্রণা উ[illegible]

পদের গাঁইটগুলি স্ফীত হইল, কবিরাজ মহাশয় দেখিয়া বলিলেন, বাতের ব্যায়রাম হইয়াছে ! বাতের কন্‌কনানি, ঝণ্‌ঝনানিতে জমিদার মহাশয় শয্যাগত হইলেন—কত পাক তৈল, কত প্রলেপ, কত স্বেদ, কত ঔষধের ব্যবস্থা হইল কিছুতেই আরোগ্য হইল না। যন্ত্রণায় যত ছট্‌ফট্‌ করেন, যত চীৎকার করেন ততই ঘন ঘন গঞ্জিকা, চরশের ধূমপান করেন। মধ্যে মধ্যে বিলাতী সরাপ্‌ পান করেন। রমণীর শিরোমণি সাবিত্রী স্বামীর সেবা করেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবা রাত্রি স্বামীর পদতলে বসিয়া শুশ্রূষা করেন।

এই সময়ে আমাদের দলের সকলে পরামর্শ করিয়া একজন ইউ-রেশীয়ন্‌কে খাস্‌ বিলাতী সাহেব বলিয়া এবং ম্যানেজারের উপযুক্ত লোক বলিয়া জমিদার মহাশয়কে বিজ্ঞাপিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে হুকুমও বাহির করিয়া লওয়া হইল। এই সাহেবটি কলিকাতার একজন ফটো-গ্রাফারের দালালী করিতেন। এই রকম লোকের স্বভাব যে কেমন তাহা আপনাদের জানিতে আর বাকী নাই। যাহাই হউক আমরা খুব সমারোহ করিয়া ম্যানেজার সাহেবকে সম্বর্দ্ধনা করিলাম, আগমন সংবাদ জ্ঞাপনার্থ পঞ্চাশটা 'বোম' পোড়ান হইল। ম্যানেজার সাহেবকে 'ধরলক্ষণ' সাজাইয়া রায়চৌধুরীর ছদ্মবেশী মিত্রের দল, বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে বাতের বেদনার যন্ত্রণা লাঘবার্থ জমিদার মহাশয়কে, মিত্রবেশী শত্রু কবিরাজ মহাশয়, অহিফেন খাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ক্রমে অহিফেনের মাত্রা সিকি ভরিতে উঠিয়াছে, তাহা আবার দিবসে দুইবার সেবন করেন।

এত সেবা করিয়াও আমাদের মাতৃস্বরূপিনী জমিদারঘরণী স্বামীর স্বাস্থ্য সম্পাদনে সমর্থা হইলেন না। অধিকন্তু সাবিত্রীর উপর জমিদার মহাশয়ের ভীষণ ক্রোধোদয় হইল। তাঁহার হাতের কুলটি পর্য্যন্ত আর

গ্রহণ করেন না। কেবল দূর দূর করেন। অসতী বলিয়া গালি দেন। প্রহার করেন। কখন কখন গৃহে আবদ্ধ করিয়া দ্বারদেশে চাবী লাগাইয়া রাখেন। একবার দুই দিন চাবী খুলিয়া দেন নাই। এদেশে সাবিত্রীর মত পুণ্যবতী, দয়াবতী ও সতী সাধ্বী রমণী আছে কি না সন্দেহ। তাঁহার দানশক্তি অসাধারণ, দরিদ্র প্রজার নিকট তিনি অন্নপূর্ণা বলিয়া পূজিতা হইতেছেন। অন্ন, বস্ত্র দিয়া শত শত বিধবাকে প্রতিপালন করিতেছেন। দীন দরিদ্র, শীতের সময় শীতবস্ত্র প্রাপ্ত হয়, ক্ষুধায় অন্ন প্রাপ্ত হয়, পীড়িত হইলে ঔষধ ও পথ্য পাইয়া থাকে। দেশের রাজ-রাজেশ্বরী মা অন্নপূর্ণা রূপিণী সাবিত্রীর উপর দুর্বৃত্ত জমিদার মহাশয়ের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অগ্নিতে লৌহ-শলাকা দগ্ধ করিয়া শরীরের স্থানে স্থানে দগ্ধ করিয়া দিতেছেন। জুতা লাথি, চড়, কিল ত নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে তাঁহাকে উপভোগ করিতে হয়। তদুপরি মাসের মধ্যে দশ দিন অনাহারে অতিবাহিত করিতে হয়। জমিদার মহাশয় শ্বশুর শাশুড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশুর কুলের চৌদ্দ-পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করেন। সতী সাধ্বী স্ত্রীর উপর কেহ কখনও এতাদৃশ অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া শ্রুত হওয়া যায় না। এটা উন্মাদ! বদ্ধ উন্মাদ হইয়াছে। কখন কখন কাটিতে যায়—গৃহে অর্গলবদ্ধ করিয়া না থাকিলে, অতি সাবধানে না থাকিলে, এত দিন সাবিত্রীর ছিন্নমস্তক মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইত।

দেশের নরনারীগণ বলিতেছে জমিদার পাগল হইয়াছে। কাহার মুখে হাত দিব সকলেই বলিতেছে—জমিদার পাগল হইয়াছে। এক দিন গাঁজা খাইয়া হুকুম দিলেন—ম্যানেজার সাব্‌কো নিকাল দেও। ভূত নহেন যে, বলিবা মাত্রই প্রস্থান করিবেন! তিনি আমি কমিশনার সাহেবকে জানাইব জমিদার পাগল—

এ রকম পাগলের হাতে এত বড় একটা ষ্টেট্ থাকিতে পারে না।” এই বলিয়া পর দিন তিনি জেলায় চলিয়া গেলেন—এখানে বলিয়া গেলেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। এই ব্যাপারে ভীরু, কাপুরুষ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, পাগলা জমিদারের আতঙ্ক হইল—সঙ্গে সঙ্গে দুইজন আমলাকে পাঠাইয়া দিলেন—যে ম্যানেজার সাহেব বাহাদুরকে ফিরাইয়া লইয়া আইস। তাহারা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল। তাঁহার পায়ে ধরিয়া বহু রজত মুদ্রা নজরানা বা জরিমানা স্বরূপ দিয়া, তাঁহাকে বিদায় করিলেন। তাহার পর একজন ম্যানেজার আনা হইল, তিনি পেনশন প্রাপ্ত বিচক্ষণ মোনসেফ। সে বেচারী একমাসের অধিক ম্যানেজারী করিতে পান নাই। তৎপরে একজন বিচক্ষণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে ম্যানেজার করা হইল, তিনি পেনশন প্রাপ্ত কি না তাহা আমার মনে নাই। এ প্রকার বিচক্ষণ বহুদর্শী, বিজ্ঞ সদাশয় ম্যানেজার আমরা কখন দেখি নাই। রাজা প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যে অদ্যাপি পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছেন তাহা আমরা জানিতাম না। ইঁহার সময়ে এতদঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। প্রকৃতিপুঞ্জ অন্নাভাবে হাহাকার করিতে আরম্ভ করে। চিফ্ ম্যানেজার মহাশয় প্রজার হিতকামনায় জমিদার মহাশয়কে বুঝাইয়া দেন যে, এই সময়ে কিছু ব্যয় করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দিলে, আপনি সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে সম্মানজনক উপাধি নিশ্চয় পাইবেন। এই সময়ে কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরদ্বয়ের জরুরী পত্র আসিল—তাহাতে দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সাহায্যের কথা লেখা ছিল।

চিফ্ ম্যানেজার মহাশয় বৎসরাবধিকাল প্রায় লক্ষাধিক [illegible] করিয়া প্রজাদিগকে চাল, ধান, অন্ন দিয়া রক্ষা করি[illegible]

সুবন্দোবস্তে জমিদারীর সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলতার সহিত দাতব্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। দেশের লোক জমিদারের অত্যাচারের কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। আমরা বুঝিলাম প্রজার হৃদয়-রক্ত পুনশ্চ কথঞ্চিৎ হৃদয়ে আসিল। প্রজা ও জমিদারের মধ্যে যত মোকদ্দমা মামলা ছিল তাহা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গেল। জমিদারীর দুর্দ্দান্ত প্রজারা চিফ্-ম্যানেজারের গুণে মুগ্ধ হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েক লক্ষ অনাদায়ী টাকা আদায় হইল।

এই সময়ে বিদ্যালয়টি উন্নত হইল, ভাল ভাল শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং ইহার শাখা স্বরূপ পাঁচ সাতটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও জমিদারীর মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল। বহু নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কোদালিয়াবাথান জমিদারীটি একটি আদর্শ জমিদারীরূপে গণ্য হইল। প্রজারা মনে করিল যেন রামরাজ্যে বাস করিতেছে। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে জমিদার মহাশয় বড়দিনের খেলাতে "রায় বাহাদুর" উপাধী পাইলেন।

রায় বাহাদুর রায়চৌধুরীর মিষ্টভাষী মিত্ররূপী শত্রুর দল প্রমাদ গণিল। আমি যদিও জমিদারকে শত্রুবৎ জ্ঞান করিয়া তাঁহার অনিষ্ট সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম কিন্তু বর্ত্তমান দেশের অবস্থা দর্শনে সে শত্রু-ভাব ত্যাগ করিলাম। প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়া যাইলাম। বৃন্দাবন বাস করিব সঙ্কল্প করিয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু চিফ্-ম্যানেজারের অনুরোধে ও অমায়িকতায় তাহা পারিলাম না। আমি [redacted] আদেশ অমান্য করিয়া জমিদারের [redacted] আমার দলের লোকে আমার [redacted] পরম মিত্র সাজিয়া তাঁহা[redacted]

চক্রান্ত আরম্ভ করিল। ভিতরে ভিতরে খাস্‌কামরায় গিয়া গঞ্জিকা সেবন কালে জমিদার মহাশয়ের সকাসে সদাশয় ম্যানেজারের নিন্দা আরম্ভ করিল। বোকা জমিদার পাগলা রায় বাহাদুর, ম্যানেজারের উপর সন্দেহ করিল। ম্যানেজারের কল্যাণে সাবিত্রীর উপর জমিদারের অত্যাচার হ্রাস পাইয়াছিল, স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মাঝে মাঝে আসিয়া রায় বাহাদুরের অতিথী হইয়া তাঁহাকে সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত চিফ্ ম্যানেজারের সদ্ভাব দর্শনে তিনি শঙ্কিত হইয়া শিষ্ট শান্ত ভাব ধারণ করিলেন।

দুষ্ট শত্রুর দল রায়বাহাদুরের পরম মিত্ররূপে অবস্থান করিয়া প্রতিদিন গোপনে খাস্‌কামরায় গঞ্জিকা সেবনকালে ম্যানেজারের নিন্দা আরম্ভ করিল। কিছুদিনের মধ্যে আফিমখোর, গাঁজাখোর জমিদার প্রজাপুঞ্জের হিতসাধন ব্যাপারে চটিয়া লাল হইলেন। ম্যানেজারের জবাব হইল। তিনি প্রজার অকল্যাণ চিন্তা করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে চলিয়া গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ



পাঁচুবাবাজীর ম্যানেজারী

"যখন পাকিবে খন্দ, পাতিবা বিষম দ্বন্দ্ব,
দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা।
খাইয়া তোমার ধন, না পালায় যেন জন,
অবশেষে নাহি পাবে দাগা ॥
দিয়ান ভেটের বেটা, বহিত আমার চিঠা,
যারে বল বুলন মণ্ডল।
থাকিতে সকল প্রজা, আগে আন মোর পূজা,
কহি দিব প্রকার সকল ॥
পরি দু-পণের কাচা, ভানিত আমার ভাচা,
সেই বেটা হবে দেশ মুখ।
নফরের হাতে খাঁড়া বহুড়ি জনের ভাড়া,
পরিণামে দেয় বড় দুঃখ ॥"

(কবিকঙ্কণ)

[redacted] প্রবল হইল। রায়বাহাদুর জমি[redacted] পাগ্‌লামির মাত্রা বাড়িয়া [redacted] এতদিন ম্যানেজারের ভয়ে গাঁ[redacted]

ছিল, ম্যানেজারের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে খাস্‌কামরায় আড্ডা জম্‌কাইয়া উঠিল। প্রজার উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। বিদ্যালয় হইতে উপযুক্ত শিক্ষকগণ একে একে বিদায় গ্রহণে বাধ্য হইলেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সদাশয় দরিদ্র বন্ধু চিকিৎসককে চক্রান্ত করিয়া বিতাড়িত করা হইল। সাবিত্রীর উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল, তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেন— দগ্ধ লৌহখণ্ড দ্বারা পৃষ্ঠে ছেঁকা দিলেন। মায়ের কেশ-দাম কর্ত্তন করিয়া দিলেন। খাস্‌কামরায় বারবিলাসিনীর আবির্ভাব হইল। গাঁজা, চরশ, আফিং, মদিরা প্রচুর পরিমাণে তথায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে ছয় মাসের মধ্যে তিন জন অবসরপ্রাপ্ত মোনসেফ ও ডেপুটী, ম্যানেজার হইলেন ও বরখাস্ত হইলেন। আমরা বুঝিলাম রায় বাহাদুর জমিদার মহাশয় অপেক্ষা যে ব্যক্তি বিদ্যায় বুদ্ধিতে হীন হইবেন, তাঁহাকেই তিনি ম্যানেজার নিযুক্ত করিবেন। বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান লোককে তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। যে ম্যানেজার তাহার কুকার্য্যে প্রশ্রয় দিবে, মোসাহেবের মত থাকিবে, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া গাঁজা, চরশ, মদের সৎব্যবহার করিতে পারিবে, যাহার স্বভাব দুনিয়ার লোকের ওঁছা হইবে, তিনিই জমিদার মহাশয়ের উপযুক্ত ম্যানেজার হইতে সমর্থ হইবেন।

আমরা জমিদার পুঙ্গবের মনোভাব অবগত হইয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিলাম যে, গৌরাঙ্গ চৌধুরীর পুত্র পাঁচু বাবুজী এই জমিদারের একমাত্র উপযুক্ত ম্যানেজার হইতে পারিবেন, পাঁচু ওরফে পঞ্চানন্দ চৌধুরী নূতন নূতন বাইজী ও বারবিলাসিনীর আমদানী করিতে পারিবেন। [illegible] চিফ-ম্যানেজারের পদটি দেওয়া হউক। [illegible] [illegible] সম্মতি প্রকাশ করিয়া সুখী হইলেন।

[illegible] কথা এই স্থানে সংক্ষেপে বলিয়া লইব। [illegible]

রুষ্ট হইবেন—কি তুষ্ট হইবেন—ইহা দেখিবার অবকাশ আমার নাই। কারণ আমি পাঁচু বাবুজীকে চিফ্-ম্যানেজারের গদিতে বসাইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিব।

পাঁচুবাবুজী কিছুদিন মালতীকুঞ্জে আমাদের হতভাগ্য মালীগঞ্জে অবস্থান করিয়া বাড়ীতে মদের ভাটি করেন। আব্‌গারীবিভাগের কর্ম্মচারীর সুনজরে পড়িয়া জেল খাটেন। একজন মুচীর একটী যুবতী স্ত্রীকে কুলের বাহির করিয়া দিন কয়েক জেলায় বাস করেন। তাহার মাতার গহনা পত্র চুরী করিয়া যে কয়েকটা টাকা হাতে করিয়াছিলেন, তাহাতে মাস কয়েক চলিয়া যায়। পরে কিছু দিন কোন আমবাগানের মালীর কার্য্য করেন, তথায় আমের কলম চুরীর জন্য বাগানের মালিক উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেন। শেষে জেলায় হোটেল করেন। এক দিন এক ভদ্র লোকের ঘড়ী ঘড়ীর চেন চুরি করিয়া কোথায় গা ঢাকা দেন। ইহার এক বৎসর কাল পরে জানিতে পারি তিনি কলিকাতার কোন মুসলমান হোটেলের বিল সরকার হইয়াছেন। এই স্থানে তাঁহার চরিত্রবল চরম উন্নতি প্রাপ্ত হয়। সেই হোটেলেই আহার করিতেন। জনৈকা মুসলমান বারবণীতার পিরিতে মজিয়া তাহার সহিত পতি পত্নী ভাবে কিছুদিন অবস্থান করেন। সেই সময়ে উক্ত হোটেলে বাবুরচীর কাজ শিক্ষা করেন। তৎপরে তথা হইতে ছয় মাস কোন সাহেবী হোটেলে বাবুরচির কর্ম্ম করিয়া সাহেবী রন্ধনে পরিপক্কতা লাভ করেন। এই সময় হইতে তাঁহার ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হন। পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক জমিদার পাঁচু বাবুজীকে নিজের দেশে লইয়া যান। [redacted] কাজ করেন। পরে উক্ত [redacted] এবং বাজার সরকারের [redacted] করিতে হইত।

এক বৎসর এই সকল কার্য্য করিয়া প্রায় পাঁচ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া গা ঢাকা দেন। অবশ্য কলিকাতায় বাজার করিতে আসিয়া গা ঢাকা দেন। এই সকল কার্য্যব্যপদেশে কতিপয় ভদ্রলোকের সহিত পাঁচুর আলাপ পরিচয় হয়। তাঁহাদের সুপারিশে ত্রিশ টাকা মাসিক মাহিনায় পাঁচু বাবুজী জনৈক জমিদারের বাজার সরকারী পদ প্রাপ্ত হন। সেই সময় পাঁচু একবার দেশে আসিয়াছিল। তখন আমাদিগকে বলে যে, সে একজন জমিদারের সহকারী ম্যানেজারের কার্য্য করে, মাসিক আশি টাকা বেতন পায়। এই সময়ে দেশে দুখানি ঘর করে এবং বিবাহ করে। পাঁচুর শ্বশুর বর্ত্তমানে আমাদের দলের লোক—জমিদার মহাশয়ের সহিত পাঁচুর শ্বশুরের বেশ আলাপ আছে। তারপর পাঁচু স্ত্রীকে লইয়া ম্যানেজারী করিতে গমন করেন। পাঁচুবাবুজী এখন ঠিক সাহেবী চালে চলেন। পোশাক পরিচ্ছদ পূর্ণ সাহেবী ধরণের।

পাঁচুর শ্বশুর মহাশয়ের প্রমুখাৎ আমাদের জমিদার রায় বাহাদুর মহাশয়কে বলা হয় যে, পঞ্চানন রায়চৌধুরী অমুক জমিদারের ম্যানেজার, বিদ্বান বুদ্ধিমান ও জমিদারীর উপযুক্ত লোক। এই সময়ে জমিদারী ষ্টেটে ম্যানেজারী পদটি শূন্য ছিল। ঠিক এই সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মফঃস্বল ভ্রমণব্যপদেশে এখানে আসিতেছেন, এই মর্ম্মে একখানি পত্র আইসে। জমিদার চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত কে কথা বলিবে, এই চিন্তাতে অস্থির হইয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময়ে আমরা পি, এন, চৌধুরীর কথা তুলিলাম। যেমন কথা তোলা [illegible] সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করিয়া এখানে [illegible] [illegible] হইতে তাঁহাকে টেলিগ্রাম করা হইল। [illegible] [illegible]—সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফে উত্তর [illegible]

তিনি দেড়শত টাকা মাসিক মাহিনায় ম্যানেজার হইয়াছেন; মফঃস্বলে যাইতে হইলে দুই শত টাকার কমে যাইতে পারেন না। তাহাও তিন-মাস পরে। এত বিলম্ব কি সহ্য হয়! জমিদার মহাশয় বলিলেন দুই শত টাকা টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডার করিয়া দাও—ইহা আসিবার খরচ। এখানে আড়াইশত টাকা মাসিক মাহিনা পাইবেন—টেলিগ্রাফ পাইবা-মাত্র রওনা হইবেন।

আদেশ প্রতিপালিত হইল। পাঁচুবাবুজীর টেলিগ্রাম পাইলাম, দুই দিনের মধ্যে এখানে পৌছাইবেন। আসিবার দিন জুড়িগাড়ি, হাতী ঘোড়া ষ্টেশনে পাঠান হইল। সন্ধ্যার সময় পাঁচু আসিলেন। এবার পূরা সিভিলিয়ান। ইংরাজী ছাড়া কথা নাই। বাঙলোতে থাকিলেন, স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের জন্য খানা প্রস্তুত করিলেন—উইলশনের হোটেল হইতে প্রচুর খাদ্যাদি আসিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এখানে যে তিন দিন ছিলেন, পাঁচুবাবুরচী তাঁহার ওস্তাদী হাতে ভাল ভাল খানা প্রস্তুত করিয়া দিতেন এবং ম্যানেজাররূপে আলাপ আপ্যায়িত করিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ভারি খুসী হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। পাঁচুসাহেবের খাতির রাতারাতি বাড়িয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে জমিদার খুসী হইয়া চারিশত টাকা মাহিনা করিয়া চিফ্-ম্যানেজার করিয়া লইলেন।

পাঁচু ওরফে পি, এন্ চৌধুরী—চিফ্-ম্যানেজার সাহেব, রায়বাহাদুরের খাস্‌কামরায় প্রধান আসন প্রাপ্ত হইলেন। দিন কয়েকের মধ্যে বাস্ক
[redacted] খাস্‌কামরায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। গাঁজা
[redacted] লাগিল। সন্ধ্যার সময় খাস্ কাম[redacted]
[redacted] বা কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলের[redacted]
[redacted] কণ্ঠধ্বনি, উচ্চহাস্য ও সঙ্গীত ত[redacted]

লাগিল। চিফ্-ম্যানেজার, জমিদারের পেয়ারের লোক হইয়া পড়িল।

জমিদার পুঙ্গবের চরম অধঃপতন আরম্ভ হইল। এক রকম বদ্ধ পাগল হইয়া উঠিলেন। চিফ্-ম্যানেজারের বেতন পাঁচশত হইল, তাহার উপর দুইশত টাকা বাসাখরচ পাইবেন। গাড়ী, ঘোড়া, হাতী ইচ্ছা মত ব্যবহার করিবেন। প্রতিদিন সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হইয়া ব্রুহেম হাঁকাইয়া ভ্রমণে বহির্গত হন। স্বামীর শোচনীয় অধঃপতনের হেতু পাঁচুবাবাজীকে, সতীসাধ্বী সাবিত্রী ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বাস-গৃহে প্রবেশ করিলে, বাসগৃহ অপবিত্র হইবে বিবেচনায় স্বামীকে তাঁহার অধঃপতনের কথা বলিয়া, বর্ত্তমান চিফ্-ম্যানেজারকে বরখাস্ত করিতে বলায়—ভীষণ প্রহার সহ্য করিলেন।

হস্তপদ বন্ধন করিয়া, উলঙ্গ করিয়া পাগ্‌লা স্বামী সতী স্ত্রীকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিতা করিয়া,তিন দিন এক বিন্দু জল না দিয়া আবদ্ধ রাখিলেন। ইহার একমাস পরে খোকাবাবুর শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইল, জমিদার সস্ত্রীক বৈদ্যনাথ চলিলেন। পথে সাবিত্রী পিত্রালয়ে প্রস্থান করিলেন। জমিদার মহাশয় ওয়ালটেয়ার গমন করিলেন। সেই দিন হইতে পাগ্‌লা রায় বাহাদুর কখন দুর্জ্জয়লিঙ্গে, কখন সিমলাশৈলে, কখন বৈদ্যনাথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সীতাকে বনবাস দিয়া রায়বাহাদুর বদ্ধ পাগল হইয়াছেন। পাছে পাগল বলিয়া রাজকর্ম্মচারীগণ অবগত হন, এই আশঙ্কায় চিফ্-ম্যানেজার চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে নানান্ স্থানে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এই সংবাদ গোপন রাখিতেছেন।

বর্ত্তমানে চিফ্-ম্যানেজার স্বয়ং জমিদার, দুই হাতে জমিদারী লুণ্ঠন করিতেছেন। লোকে বলে চিফ্-ম্যানেজার সাহেব 'বশ' করিতে জানেন। এ [illegible] কি মিথ্যা তাহা ঈশ্বর জানেন। আমরা জানি পাঁচুবাবাজী

বড়ই বিষম লোক! প্রজারা রাম সীতার অভাবে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। মিত্ররূপী শত্রুর দল নৃত্য করিতেছে। প্রজার ক্রন্দনে দিক্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে। চতুর চিফ্‌-ম্যানেজার কৌশলে সকল তাল সামলাইয়া লইয়া রামরাজত্ব করিতেছেন। পেশাদার লোক রাখিয়া তাঁহার সুখ্যাতি ও সুশাসনের কথা রাষ্ট্র করিতেছেন। আমরা বলি —পাঁচুবাবুজীর জয় জয়কার হউক।

"সোণারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিত্তল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল॥"



পরিশিষ্ট



আর কিছু বলিবার নাই। যাহা হইবার তাহা হইবে। অভিশপ্ত অর্থ পঞ্চভূতে খাইবেই। সে জন্য কাহার দুঃখ করিবার উপায় নাই। আমি দেশের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছি। পাঁচুর মা গঙ্গালাভ করিয়াছেন। পাঁচুর সম্পত্তি পাঁচুকে দিয়া আমি ৺বৃন্দাবন বাসে চলিলাম। পাঁচুর এখন সপ্তমে বৃহস্পতি। পাঁচুর জয় জয়কার হউক, ভবিষ্যতে যদি দু পাঁচ বৎসর বাঁচিয়া থাকি, গণ্‌শার পরিশিষ্ট অংশটুকু ভাল করিয়া লিখিব। এখন ৺বৃন্দাবনের রজে দেহ রাখিতে পারিলেই মঙ্গল! রাধারাণীর ইচ্ছা কত দূর কি হইবে বলিতে পারি না। মালিগঞ্জে গণেশ জাতির শোচনীয় দুর্দ্দশা হইয়াছে। এ জাতি ধরায় আর বেশী দিন থাকিবে না। কেহ কি গণেশ জাতিকে দেখিবেন! যদি দেশ হইতে একটা জাতির লোপ দেখিতে কাহার ইচ্ছা না হয়, যদি দেশের একটা পুরাতন জাতিকে রক্ষা করিতে কাহার ইচ্ছা হয়, দয়া করিয়া 'গণেশ' জাতিকে রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী

১। বিশ্ব-শক্তি (দেশের ও দশের কথায় পরিপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ)।
—মূল্য ১।০ একটাকা চারি আনা।

২। রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের বাণী (কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিতার সমালোচনা) —মূল্য ৷৶০ দশ আনা।

৩। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্ (শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবমুখনিঃসৃত উপদেশাষ্টক) —মূল্য ৵০ দুই আনা।

৪। বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ, প্রণীত
—মূল্য ৷৶০ দশ আনা।

৫। কমলা (গার্হস্থ্য উপন্যাস) —মূল্য ১।০ একটাকা চারি আনা।

৬। পাগল (একাধারে প্রেমভক্তি ও তত্ত্বকথার সমন্বয়)
—মূল্য ৷৶০ দশ আনা।

৭। নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর (নিগ্রোনায়ক বুকার ওয়াশিংটনের আত্মজীবন-চরিত) শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ, প্রণীত
—মূল্য ১৷০ একটাকা আট আনা।

৮। বর্ত্তমান জগৎ প্রথম খণ্ড, মিশর ঐ ঐ
—মূল্য ১৷০ একটাকা আট আনা।

৯। বর্ত্তমান জগৎ দ্বিতীয়খণ্ড, ইংরাজের জন্মভূমি ঐ ঐ
—মূল্য ২৷০ দুই টাকা আট আনা।

১০। বঙ্গীয় পতিতজাতির কর্ম্মী শ্রীহরিদাস পালিত প্রণীত
—মূল্য ১৲ এক টাকা।

১১। চান্দেলী (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ঐ—মূল্য ৸০ বার আনা।

১২। সোনার দেশ (সচিত্র শিশুপাঠ্য গ্রন্থ) ঐ—মূল্য ।০ চারি আনা।

১৩। স্বপ্ন-শা (কাহিনী) — ঐ মূল্য ৷৶০ দশ আনা।

১৪। বিসূচিকা-দর্পণ ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ [redacted]
—মূল্য ২৷০, [redacted]

গৃহস্থ পাব্লিশিং [redacted]
২৪ নং মিডিল রোড, [redacted]